বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ

শ্রীমদ্ভগবদগীতা

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে
শ্রীমন্মথমোহন বসু কর্তৃক
প্রকাশিত

ফাল্গুন, ১৩৪৭

দেড় টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক
মুদ্রিত

ভূমিকা

জামাতা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'প্রচারে' ১২৯৩ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ (২য় বৎসর, প্রথম সংখ্যা) হইতে বঙ্কিমচন্দ্র ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যান আরম্ভ করেন। ঐ বৎসরের শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন-কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষোল শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা-সমেত প্রকাশিত হইয়া 'প্রচারে' গীতা-প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। ১২৯৫ সালের বৈশাখ হইতে পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের সতেরো শ্লোক হইতে ব্যাখ্যা সুরু হয়; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন, কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ-মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হয়। 'প্রচার'ও ঐ সংখ্যা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। পরে অন্য কোনও সাময়িক-পত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতা-ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালবাবুর পুত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বঙ্কিমচন্দ্রের টীকা-সম্বলিত 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা' প্রকাশ করেন। তিনি "সংগ্রহকারের নিবেদনে" লিখিয়াছেন :—

> ...প্রচারে যেটুকু বাহির হইয়াছিল এবং হস্তলিপিতে যেটুকু পাওয়া গেল, তাহা এই পুস্তকে সংগৃহীত হইল।...তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] যেটুকু লিখিয়া গিয়াছিলেন, কেবল সেইটুকু মুদ্রিত করিলেই চলিত। কিন্তু গীতার ন্যায় একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দুমাত্রেই স্বীয় গৃহে সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন এবং রাখার প্রয়োজনও আছে। এজন্য অবশিষ্ট মূলও স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কৃত অনুবাদ সহ ইহাতে নিবেশিত হইল।...

দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমরা বর্ত্তমান সংস্করণে সেইটুকুমাত্র পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

'প্রচার' হইতে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রণকালে স্থানে স্থানে কথা পড়িয়া গিয়াছে। অন্যান্য কয়েকটি ভুল যাহা আমাদের নজরে পড়িয়াছে, শুদ্ধিপত্রে তাহা সংশোধন করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত সংস্করণ হইতে]

ভূমিকা

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভাষ্য ও টীকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। তবে ঐ সকল ভাষ্য ও টীকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত। এখনকার দিনে এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কৃত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক। কিন্তু গীতা এমনই দুরূহ গ্রন্থ যে, টীকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রয়োজনীয়।

বাঙ্গালা টীকা দুই প্রকার হইতে পারে। এক, শঙ্করাদি প্রণীত প্রাচীন ভাষ্যের ও টীকার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়, নূতন বাঙ্গালা টীকা প্রণয়ন করা যাইতে পারে। কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। বাবু হিতলাল মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভাষ্যের সারাংশ কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টীকার সারাংশ সঙ্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীতা টীকার মর্ম্মার্থ দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ ঋণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্যত হইয়াছেন; বিজ্ঞাপনে দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ থাকিবে। ইহা বাঙ্গালী পাঠকের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত "গীতাসন্দীপনী" নামে একখানি বাঙ্গালা টীকা প্রকাশ করিতেছেন। ইহা সুখের বিষয় যে, "গীতাসন্দীপনী"তে গীতার মর্ম্ম পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, সেইরূপ বুঝান হইতেছে। বাঙ্গালী পাঠকেরা শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্জন্য কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সকল অনুবাদ বা টীকা থাকাতেও, মাদৃশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টীকা প্রকাশে প্রবৃত্ত হওয়া বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার যথার্থ প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন কি তাহা বুঝাইতেছি।

এখনকার পাঠকদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই "শিক্ষিত"-সম্প্রদায়ভুক্ত। যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁহাদিগেরই সচরাচর "শিক্ষিত" বলা হইয়া থাকে; আমি

প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হইয়াই তদর্থে "শিক্ষিত" শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও শিক্ষা বেশী কাহারও শিক্ষা কম, কিন্তু কম হউক, বেশী হউক, এখনকার পাঠক অধিকাংশই "শিক্ষিত" সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহা আমার জানা আছে। এখন গোলযোগের কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতদিগের উক্তি সহজে বুঝিতে পারেন না। বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলেও তাহা বুঝিতে পারেন না। যেমন টোলের পণ্ডিতেরা, পাশ্চাত্যদিগের উক্তির অনুবাদ দেখিয়াও সহজে বুঝিতে পারেন না, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাঁহারা প্রাচীন প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের বাক্য কেবল অনুবাদ করিয়া দিলে সহজে বুঝিতে পারেন না। ইহা তাঁহাদিগের দোষ নহে, তাঁহাদিগের শিক্ষার নৈসর্গিক ফল। পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না। এখন, আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপিরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাব সকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।

ইহার আরও বিশেষ প্রয়োজন এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের কৃত ভাষ্যাদিতে তাহার মীমাংসা নাই। থাকিবারও সম্ভাবনা নাই; কেন না, তাঁহারা যে সকল পাঠকের সাহায্য জন্য ভাষ্যাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত হইবার সম্ভাবনাই ছিল না। এই টীকায় যত দূর সাধ্য সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা করা গিয়াছে।

অতএব, যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন, বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্ব্বপণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দগিরি-টীকা-সম্বলিত শাঙ্কর ভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা, রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত টীকা ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে,

এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্ব্বত্র তাঁহাদের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্ব্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

কলিকাতা।
১২৯৩ সাল।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১ ॥

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও পাণ্ডবেরা কি করিল? ১।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বের অন্তর্গত। ভীষ্মপর্ব্বের ৩ অধ্যায় হইতে ৪৩ অধ্যায় পর্য্যন্ত—এই অংশের নাম ভগবদ্গীতাপর্ব্বাধ্যায়; কিন্তু ভগবদ্গীতার আরম্ভ, পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ে। তৎপূর্ব্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা সকল পাঠক জানিতে না পারেন, এজন্য তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। কেন না, তাহা না বলিলে, ধৃতরাষ্ট্র কেন এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না।

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যসমৃদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্য্যোধন তাহা অপহরণ করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠিরকে কপটদ্যূতে আহ্বান করেন। যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে পরাজিত হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বৎসর তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ বনবাস করিবেন, তার পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবেন। এই ত্রয়োদশ বৎসর দুর্য্যোধন তাঁহাদিগের রাজ্য ভোগ করিবেন। তার পর, পাণ্ডবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে, আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে যাপন করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কাজেই পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিয়া স্বরাজ্যের উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষ সেনা সংগ্রহ করিলেন। উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইল। যখন উভয় সেনা পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, তখন এই গীতার আরম্ভ।

ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন—তিনি হস্তিনা নগরে আপনার রাজভবনে আছেন। তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া যুদ্ধদর্শন-সুখেও বঞ্চিত। কিন্তু যুদ্ধে কি হয়, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতে ইচ্ছা

করিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন যে, "আমি জ্ঞাতিবধ সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি না, আপনার তেজঃ-প্রভাবে আদ্যোপান্ত এই যুদ্ধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিব।" তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত সকল দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্র মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করিতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন। মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্বগুলি এই প্রণালীতে লিখিত। সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে, উভয়পক্ষীয় সেনা যুদ্ধার্থ পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, উভয় পক্ষ কি করিলেন। গীতার এইরূপ আরম্ভ।

এই দিব্যচক্ষুর কথাটা অনৈসর্গিক, পাঠককে বিশ্বাস করিতে বলি না। গীতোক্ত ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই। পাঠক ইচ্ছা করিলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন। আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই ; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তবে শ্রেণীবিশেষের পাঠক কোন কোন বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতে পারেন। এজন্য দুই একটা কথা লেখা গেল।

কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ। ঐ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী। আম্বালা নগর হইতে উহা ১৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইতে উহা ২০ ক্রোশ উত্তর। কুরুক্ষেত্র ও পানিপাট ভারতবর্ষের যুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য অনেক বার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি পাইয়াছে। "ক্ষেত্র" নাম শুনিয়া ভরসা করি, কেহ একখানি মাঠ বুঝিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীনকালেই পঞ্চ যোজন দীর্ঘে এবং পঞ্চ যোজন প্রস্থে। এই জন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত। চক্রের সীমা এখন আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

কুরু নামে এক জন চন্দ্রবংশীয় রাজা ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই চক্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। তিনি দুর্য্যোধনাদির ও পাণ্ডবদিগের পূর্ব্বপুরুষ ; এজন্য দুর্য্যোধনাদিকে কৌরব বলা হয়, এবং কখন কখন, পাণ্ডবদিগকেও বলা হয়। তিনি এই স্থানে তপস্যা করিয়া বরলাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহার তপস্যার কারণই উহা পুণ্যতীর্থ। ফলে চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা

ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মখো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনম্।" অর্থাৎ দেবতারা এইখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে "দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান" বলে।

মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ। বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের সীমা এইরূপ লেখা আছে—"উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী।" (৮৩ অধ্যায়) মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রহ্মাবর্ত্তেরও ঠিক সেই সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে। ২। ১৭।

অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত একই। কালিদাসের নিম্নলিখিত কবিতাতে তাহাই বুঝা যাইতেছে।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্রপ্রধনপিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্ মুখানি ॥
মেঘদূত ৪৯।

কিন্তু মনুতে আবার অন্য প্রকার আছে। যথা—

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ ॥

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পরিব্রাজক হিউন্‌সাঙ্‌ও ইহাকে স্বীয় গ্রন্থে "ধর্ম্মক্ষেত্র" বলিয়াছেন।*

কুরুক্ষেত্র আজিও পুণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিচিত; অনেক যোগী সন্ন্যাসী তথা পরিভ্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি মহাভারতের যুদ্ধের স্মারক স্বরূপ। যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরথিকর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে 'অভিমন্যুক্ষেত্র' বা 'অমিন' বলিয়া থাকে। সেখানে আজিও পুত্রহীনারা পুত্রকামনায় অদিতির মন্দিরে অদিতির উপাসনা করে। যেখানে

* M. Stanislaus Julien অনুবাদে লিখিয়াছেন, "*Le champ du bonheur*," অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদিগের সৎকার সমাপন হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 'অস্থিপুর' বলে। যেখানে সাত্যকিতে ও ভূরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জ্জুন সাত্যকির রক্ষার্থ অন্যায় করিয়া ভূরিশ্রবার বাহুচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে "ভোর" বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভূরিশ্রবার সালঙ্কার ছিন্নহস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই ছিন্ন হস্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল। তাহাই কহীনুর, এক্ষণে ভারতেশ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে। কথাটা যে সত্য, তাহার অবশ্য কোন প্রমাণ নাই।

কুরুক্ষেত্রের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, "কুলুক্ষেত্র হইতেছে।" অথচ কুরুক্ষেত্রের সবিশেষ তত্ত্ব কেহই জানে না। বিশেষ টম্‌সন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সবিশেষ না জানিয়া অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের কথা এখানে এত সবিস্তারে লেখা গেল।*

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

ব্যূহিত পাণ্ডবসৈন্য দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের নিকটে গিয়া বলিলেন। ২।

দুর্য্যোধনাদির অস্ত্রবিদ্যার আচার্য্য ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণ। ইনি পাণ্ডবদিগেরও গুরু। ইনি ব্রাহ্মণ। কিন্তু যুদ্ধবিদ্যায় অদ্বিতীয়। শস্ত্রবিদ্যা ক্ষত্রিয়দিগেরই ছিল, এমন নহে। দ্রোণাচার্য্য, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, ইঁহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ সচরাচর ক্ষত্রিয়দিগের অপেক্ষা যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। যখন পশ্চাৎ স্বধর্ম্মপালনের কথা উঠিবে, তখন এই কথা স্মরণ করিতে হইবে।

যুদ্ধার্থ সৈন্য-সন্নিবেশকে ব্যূহ বলে।

---

* সাহেবদিগের ভ্রমের উদাহরণস্বরূপ গীতার অনুবাদক টম্‌সনের টীকা হইতে দুই ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন,—

"A part of Dharmmakshetra, the flat plain around Dehli, which city is often indentified with Hastinapur, the capital of Kurukshetra."

এইটুকুর ভিতর ৫টি ভুল। (১) ধর্ম্মক্ষেত্র নামে কোন স্বতন্ত্র ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) "The flat plain around Dehli" কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল্লী হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুক্ষেত্রের রাজধানী নহে। এতটুকুর ভিতর এতগুলি ভুল একত্র করা যায়, আমরা জানিতাম না।

সমগ্রস্ত তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ।
স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্ ॥

আধুনিক ইউরোপীয় সমরে সেনাপতির ব্যূহরচনাই প্রধান কার্য্য।

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

হে আচার্য্য! আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্রের দ্বারা ব্যূহিতা পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা দর্শন করুন। ৩।

দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন, পাণ্ডবদিগের একজন সেনাপতি। তিনিই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ করিলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনিও দ্রোণের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত হইতেছেন। এ কথাটা স্বধর্ম্মপালন বুঝিবার সময়ে স্মরণ করিতে হইবে। নিজ বধার্থ উৎপন্ন শত্রুকে দ্রোণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্ম বিদ্যা দান।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

ইহার মধ্যে শূর, বাণক্ষেপে মহান্, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য, যুযুধান, (১) বিরাট, (২) মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, (৪) নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদীর পুত্রগণ, ইহারা সকলেই মহারথ। ৪। ৫। ৬।

(১) যুযুধান—যদুবংশীয় মহাবীর সাত্যকি।

(২) দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষৌহিণীপতি।

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চেদি দেশের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অন্যবিধ বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ১৭১ অধ্যায়)।

(৪) কুন্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃষ্বসৃ-পুত্র। পাণ্ডবমাতা কুন্তী তাঁহার ভবনে প্রতিপালিতা হয়েন। পুরুজিৎ এ সম্বন্ধে পাণ্ডব-মাতুল।

(৫) বিখ্যাত অভিমন্যু।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজোত্তম! আমাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাঁহাদিগকে অবগত হউন। আপনার অবগতির জন্য সে সকল আপনাকে বলিতেছি। ৭।

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥ *

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপ, (৬) অশ্বত্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র (৮) ও জয়দ্রথ (৯)। ৮।

(৬) ইনিও ব্রাহ্মণ এবং অস্ত্রবিদ্যায় কৌরবদিগের আচার্য্য।

(৭) দ্রোণপুত্র।

(৮) ইনিই বিখ্যাত ভূরিশ্রবা।

(৯) দুর্য্যোধনের ভগিনীপতি।

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

আরও অনেক অনেক বীর আমার জন্য ত্যক্তজীবন হইয়াছেন (অর্থাৎ জীবনত্যাগে প্রস্তুত হইয়াছেন)। তাঁহারা সকলে নানাস্ত্রধারী এবং যুদ্ধবিশারদ। ৯।

গীতার প্রথমাধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই। কিন্তু প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট। উপরে উভয় পক্ষের বহু গুণবান্ সেনানায়কদিগের নাম যে পাঠককে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল, ইহা কবির একটা কৌশল। পশ্চাতে অর্জ্জুনের যে করুণাময়ী মনোমোহিনী উক্তি লিখিত হইয়াছে, তাহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে।

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০ ॥

ভীষ্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈন্য অসমর্থ। আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত সৈন্য সমর্থ। ১০।

পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ শ্রীধরস্বামীর টীকানুসারে করা গেল। অন্যে অর্থ করিয়াছেন—পরিমিত এবং অপরিমিত।

---

* সৌমদত্তিস্তথৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

আপনারা সকলে স্ব-স্ব বিভাগানুসারে সকল ব্যূহদ্বারে অবস্থিতি করিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করুন। ১১।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনের সেনাপতি।

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২ ॥

(তখন) প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) দুর্য্যোধনের হর্ষ জন্মাইয়া উচ্চ সিংহনাদ করতঃ শঙ্খধ্বনি করিলেন। ১২।

পূর্ব্বকালে রথিগণ যুদ্ধের পূর্ব্বে শঙ্খধ্বনি করিতেন। ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের ভাই।

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

তখন, শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনক, গোমুখ সকল (বাদ্যযন্ত্র) সহসা আহত হইলে সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল। ১৩।

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

তখন, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ণার্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪।

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫ ॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ ॥

কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত এবং ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ, এবং সহদেব মণিপুষ্পক (নামে) শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫। ১৬।

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮ ॥

পরম ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র,—হে পৃথিবীপতে!—ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন। ১৭। ১৮।

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্॥ ১৯॥*

সেই শব্দ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ও আকাশ এবং পৃথিবীকে তুমুল ধ্বনিত করিল। ১৯।

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে॥ ২০॥

পরে হে মহীপতে!† ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অস্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত্ত কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধনু উত্তোলন করিয়া হৃষীকেশকে এই কথা বলিলেন। ২০।

"ব্যবস্থিত" শব্দের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, "যুদ্ধোদ্যোগে অবস্থিত।"

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত॥ ২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ॥ ২৩॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

যাহারা যুদ্ধ-কামনায় অবস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই রণ-সমুদ্যমে কাহাদিগের সঙ্গে আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি), যাহারা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়চিকীর্ষায় এইখানে যুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থিদিগকে (যাবৎ) আমি দেখি, (তাবৎ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর। ২১। ২২। ২৩।

---

* তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্ ইতি পাঠান্তর আছে।

† বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে, সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞ্জয় কুরুক্ষেত্রের বৃত্তান্ত ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

হে ভারত ! * অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ এইরূপ অভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ ! সমবেত কুরুগণকে এই নিরীক্ষণ কর। ২৪। ২৫।

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

তখন অর্জ্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ, পিতামহগণ, আচার্য্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পৌত্রগণ, শ্বশুরগণ, সখিগণ† এবং সুহৃদ্‌গণকে দেখিলেন। ২৬।

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

সেই কুন্তীপুত্র সেই সকল বন্ধুগণকে অবস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট হইয়া বিষাদপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। ২৭।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।‡
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ ! এই যুদ্ধেচ্ছু সম্মুখে অবস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮।

---

* ধৃতরাষ্ট্র এবং অর্জ্জুন উভয়কেই "ভারত" বলিয়া এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহার কারণ, ইঁহারা দুষ্মন্তপুত্র ভরতের বংশ।

† সখা ও সুহৃদে অবশ্য প্রভেদ আছে। যাঁহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে, সেই সখা।

‡ দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ইতি পাঠান্তর আছে।

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

আমার দেহ কাঁপিতেছে, রোমহর্ষ জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে এবং চর্ম্ম জ্বালা করিতেছে। ২৯।

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥ ৩০ ॥

হে কেশব! আমি আর থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি। ৩০।

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥ ৩১ ॥

যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি কোন মঙ্গল দেখি না—হে কৃষ্ণ! আমি জয় চাহি না, রাজ্যসুখ চাহি না। ৩১।

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥ ৩২ ॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥

যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য্য, পিতা, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ করিয়া এই যুদ্ধে অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই কাজ কি? হে মধুসূদন! আমি হত হই হইব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করি না। ৩২। ৩৩। ৩৪।

"আমি হত হই হইব (ঘ্নতোঽপি)" কথার তাৎপর্য্য এই যে, "আমি না মারিলে তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদি তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি আমি তাহাদিগকে মারিব না। বস্তুতঃ ভীষ্ম, দ্রোণের সহিত অর্জ্জুন এই ভাবেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনের "মৃদুযুদ্ধের" কথা আমরা অনেকবার শুনিতে পাই।

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫ ॥

পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে বধ করিলে কি সুখ হইবে, জনার্দ্দন ? । ৩৫ ।

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্ ।*
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৬ ॥

এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না। হে মাধব! স্বজন হত্যা করিয়া আমরা কি প্রকারে সুখী হইব ? । ৩৬ ।

ছয় জনকে আততায়ী বলে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥

যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শস্ত্রপাণি, ধনাপহারী, ভূমি যে অপহরণ করে, ও বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য। টীকাকারেরা অর্জ্জুনের বাক্যের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী বধ্য, তথাপি ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য। ধর্ম্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ব্বল, সুতরাং দ্রোণ ভীষ্মাদি আততায়ী হইলেও তাঁহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে। একালে আমরা "Law" এবং "Morality"র মধ্যে যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ। "Law"র উপর "Morals"। ইংরেজের পিনাল কোডেও লিখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই। কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্রসঙ্গত নহে।

আনন্দগিরি এই শ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, এমনও বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব ; সুতরাং আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। "গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ।"

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৭ ॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুং।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥ ৩৮ ॥

---

* স্ববান্ধবান্ ইতি পাঠান্তর আছে।

যদ্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রদ্রোহে যে পাতক তাহা দেখিতেছে না, কিন্তু হে জনার্দ্দন! আমরা কুলক্ষয় করার দোষ দেখিতেছি, আমরা সে পাপ হইতে নিবৃত্তিবুদ্ধিবিশিষ্ট কেন না হইব? । ৩৭ । ৩৮ ।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৩৯ ॥

কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয়। ৩৯।

সনাতন কুলধর্ম্ম—অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা-প্রাপ্ত কুলধর্ম্ম।

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়, স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে, হে বার্ষ্ণেয়! * বর্ণসঙ্কর জন্মায়। ৪০।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪১ ॥

এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয়। পিণ্ডোদক-ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পতিত হয়। ৪১।

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥

এইরূপ কুলঘ্নদিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধর্ম্ম এবং সনাতন কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়। ৪২।

উৎসন্নকুলধর্ম্মানাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন ।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যদিগের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩।

৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকদিগের কানে ভাল লাগিবে না। ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ" প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ

* কৃষ্ণ বৃষ্ণিবংশসম্ভূত, এজন্য বার্ষ্ণেয়।

বিদ্বেষ দেখা যায়। ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব। এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে। বংশ নীচসন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন, এবং পিণ্ডাদির স্বর্গকারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান্ নহেন—স্বর্গ নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি, এতটুকু স্বীকার করিবেন।* বাকীটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার।† কথাটা অতি মোটা কথা বটে। কথাটা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে—অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্মের" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ "স্বধর্ম্মের" কথাটা তুলিবেন। এটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ" এই অমৃতময় বাক্যের পর বলিবার যোগ্য কথা এ নহে।

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ং।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

হায়! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি—মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি। ৪৪।

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

---

* The women, for instance, whose husbands, friends or relations have been all slain in battle, no longer restrained by law, seek husbands among other and lower castes, or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil; but particularly those who—like the Aryans, the Jews and the Scotch—were at first surrounded by foreigners very different to themselves, and thus preserved the distinction and genealogies of their races more effectively than any other.

(Thomson's *Translation of the Bhagavadgita*, p. 7.)

* By the destruction of the males the rites of both tribe and family would cease, because women were not allowed to perform them; and confusion of castes would arise, for the women would marry men of another caste. Such marriages were considered impure (Manu, x. 1-40). Such marriages produced elsewhere a confusion of classes. Livy tells us that the Roman patricians at the instance of Canuleius complained of the intermarriages of the plebian class with their own, affirming that "omnia divina humanaque turbari, ut qui natus sit, ignoret, cujus sanguinis, quorum sacrorum sit."

(Davies' *Translation of the Bhagavadgita*, p. 26)

† In bringing forward these and other melancholy superstitions of Brahmanism in the mouth of Arjuna, we are not to suppose that our poet—though as much Brahman as philosopher in many unimportant points of belief—himself received and approved of them.

(Thomson, p. 7)

যদি আমি প্রতিকারপরাঙ্মুখ এবং অশস্ত্র হইলে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে। ৪৫।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ॥ ৪৬॥

সঞ্জয় বলিলেন—

অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে রথোপস্থে উপবেশন করিলেন। ৪৬।

ইতি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে
শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসম্বাদে অর্জ্জুনবিষাদো *
নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলিয়াছি, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধর্ম্মতত্ত্ব কিছু নাই, কিন্তু এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজান হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রে উভয় সেনা সুসজ্জিত হইয়া পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছে। পাণ্ডবদিগের মহতী সেনা ব্যূহবদ্ধা হইয়াছে দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন, পরম রণপণ্ডিত আপনার আচার্য্যকে দেখাইলেন। একটু ভীত হইয়া আচার্য্যকে বলিলেন, "আপনারা আমার সেনাপতি ভীষ্মকে রক্ষা করিবেন।" কিন্তু সেই বৃদ্ধ ভীষ্ম যুবার অপেক্ষাও উদ্যমশীল—তিনি সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন—(শঙ্খ তখনকার bugle)। তাঁহার শঙ্খধ্বনি শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুত্তরে উভয় সৈন্যস্থ যোদ্ধৃগণ সকলেই শঙ্খধ্বনি করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল—শঙ্খে, ভেরীতে, অন্যান্য বাদ্যের কোলাহলে, গগন বিদীর্ণ হইল—আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়া উঠিল। সেই মহোৎসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অর্জ্জুন—যাঁহার উপরে কৌরব-জয়ের ভার—আপনার সারথি কৃষ্ণকে বলিলেন—"একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি—দেখি, কাহার সঙ্গে আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে।" কৃষ্ণ, শ্বেতাশ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত করিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তা বলিলেন, "এই দেখ।" অর্জ্জুন দেখিলেন, দুই দিকেই ত আপনার জন,—পিতৃব্য, পিতামহ, পুত্র, পৌত্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, সুহৃৎ, সখা—তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, মাথা ঘুরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডীব খসিয়া পড়িল। বলিলেন,

* কোন কোন পুস্তকে "সৈন্যদর্শনং" ইতি পাঠ আছে।

"কৃষ্ণ! রাজ্য যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে কি ফল?—আমি যুদ্ধ করিব না।" এই সংগ্রামক্ষেত্র, দুই দিকে দুই মহতী সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাদ্য এবং ঘোরতর উৎসাহ—সেই সময়ে এই মহাবীরের প্রথমে স্থৈর্য্য, তার পর তাঁহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং মহান্ প্রশান্ত ভাব—এরূপ মহচ্চিত্র সাহিত্যজগতে দুর্লভ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং সুখানি চ"—ঈদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে?

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সঞ্জয় উবাচ।

তন্তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ১ ॥

সঞ্জয় বলিলেন—

তখন সেই কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণাকুললোচন বিষাদযুক্ত (অর্জ্জুন)-কে মধুসূদন এই কথা বলিলেন। ১।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই সঙ্কটে অনার্য্যসেবিত স্বর্গহানিকর এবং অকীর্ত্তিকর তোমার এই মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল?। ২।

মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয় * নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩ ॥

হে কৌন্তেয়! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগ করিয়া উত্থান কর। ৩।

অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

* "ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ" ইতি আনন্দগিরি-ধৃত পাঠ।

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে শত্রুনিসূদন মধুসূদন! পূজার্হ যে ভীষ্ম এবং দ্রোণ, যুদ্ধে তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা কি প্রকারে আমি প্রতিযুদ্ধ করিব?। ৪।

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫ ॥

মহানুভব গুরুদিগকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন করিতে হয়, সেও শ্রেয়। আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহা রুধিরলিপ্ত। ৫।

ন চৈতদ্বিদ্ম কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬ ॥

আমরা জয়ী হই, বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না—যাহাদিগকে বধ করিয়া আমরা বাঁচিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ সম্মুখে অবস্থিত। ৬।

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

কার্পণ্য দোষে আমি অভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিমূঢ় হইয়াছে, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি। যাহা ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত করিয়া বল। আমি তোমার শিষ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি—আমাকে শিক্ষা দাও। ৭।

কার্পণ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ 'বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া উদাহরণ-স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভরসা করি, কোন পাঠকই এখানে দীনতা অর্থে দারিদ্র্য বুঝিবেন না। 'দীন' অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত। উদাহরণস্বরূপ—তারানাথ রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা:—"মহদ্বা ব্যসনং প্রাপ্তো দীনঃ

কৃপণ উচ্যতে।" আনন্দগিরি বলেন—"যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণঃ।" যে সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ।* শ্রীধরস্বামী বুঝাইয়াছেন যে, "এই সকল বন্ধুবর্গকে নষ্ট করিয়া কি প্রাণ ধারণ করিব ?" অর্জ্জুনের ইতি বুদ্ধিই কার্পণ্য। তিনি "কার্পণ্যদোষ" ইতি সমাসকে দ্বন্দ্ব সমাস বুঝিয়াছেন—কার্পণ্য এবং দোষ। দোষ শব্দে এখানে পূর্ব্বকথিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুঝিতে হইবে। অন্যান্য টীকাকারেরা সেরূপ অর্থ করেন নাই।

নহি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্-
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধম্
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

পৃথিবীতে অসপত্ন সমৃদ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে বিশোষণ করিবে, তাহা কিসে যাইবে, আমি দেখিতেছি না। ৮।

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥ ৯ ॥

সঞ্জয় বলিতেছেন—

শত্রুজয়ী অর্জ্জুন † হৃষীকেশকে এইরূপ বলিয়া, যুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। ৯।

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

হে ভারত! হৃষীকেশ হাস্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন। ১০।

শ্রীভগবান্ উবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥ ১১ ॥

---

* কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং "কার্পণ্য" শব্দের প্রতিবাক্য দিয়াছেন "helplessness."

† মূলে "গুড়াকেশ" শব্দ আছে। গুড়াকেশ অর্জ্জুনের একটি নাম। টীকাকারেরা ইহার অর্থ করেন 'নিদ্রাজয়ী'। অন্যবিধ অর্থও দেখা গিয়াছে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

তুমি বিজ্ঞের ন্যায় কথা কহিতেছ বটে ; কিন্তু যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পণ্ডিতেরা শোক করেন না। ১১।

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারম্ভ। এখন, কি কথাটা উঠিতেছে, তাহা বুঝিয়া দেখা যাউক।

দুর্য্যোধনাদি অন্যায়পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে। যুদ্ধ বিনা তাহার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই। এখানে যুদ্ধ কি কর্ত্তব্য ?

মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে। বিচারে স্থির হইয়াছিল যে, যুদ্ধই কর্ত্তব্য। তাই এই উভয় সেনা সংগৃহীত হইয়া পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে।

এ অবস্থায় যুদ্ধ কর্ত্তব্য কি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করিলেও, আমরা পাণ্ডবদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য স্বীকার করিব। এই জগতে যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তন্মধ্যে সচরাচর যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আমেরিকায় ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেণ্ট, এবং ভারতবর্ষে প্রতাপসিংহ প্রভৃতি যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্ম্ম—দানাদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। পাণ্ডবদিগেরও এই যুদ্ধপ্রবৃত্তি সেই শ্রেণীর ধর্ম্ম। এ বিচার আমি কৃষ্ণচরিত্রে সবিস্তারে করিয়াছি—এক্ষণে সে সকল পুনরুক্ত করিবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থূল মর্ম্ম এই যে, যেটি যাহার ধর্ম্মানুমত অধিকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম্ম। রক্ষার অর্থ এই যে, কেহ অন্যায়পূর্ব্বক তাহার অপহরণ বা অবরোধ করিতে না পারে ; করিলে তাহার পুনরুদ্ধার এবং অপহর্ত্তার দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত পরকে অধিকারচ্যুত করিয়া সচ্ছন্দে পরস্বাপহরণপূর্ব্বক উপভোগ করিতে পারে, তবে সমাজ এক দিন টিকে না। সকল মনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ করিবে। অতএব আপনার সম্পত্তির পুনরুদ্ধার কর্ত্তব্য। যদি বল ভিন্ন অন্য সদুপায় থাকে, তবে তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যদি বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য। এখানে বলই ধর্ম্ম।

মহাভারতে দেখি যে, অর্জ্জুন ইতিপূর্ব্বে সকল সময়েই যুদ্ধপক্ষ ছিলেন। যখন, যুদ্ধে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্বজনবর্গের মুখ দেখিয়া তিনি যে কাতরচিত্ত ও যুদ্ধবুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবসুলভ ভ্রান্তি।

---

* এবং নবজীবন প্রথম খণ্ড দেখ।

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। পরে যখন যুদ্ধ অলংঘ্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি যুদ্ধে কোন পক্ষে ব্রতী হইতে অস্বীকৃত হইয়া কেবল অর্জ্জুনের সারথ্য মাত্র স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলেও তিনি পরম ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্ম্মের পথ কোন্‌টা, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইতে বাধ্য। অতএব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন যে, যুদ্ধ করাই এখানে ধর্ম্ম, যুদ্ধ না করাই অধর্ম্ম।

বাস্তবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারম্ভসময়ে কৃষ্ণার্জ্জুনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু গীতাকার এইরূপ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ম্মের সার মর্ম্ম সঙ্কলিত করিয়া মহাভারতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

১ যুদ্ধে প্রবৃত্তিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে দিতেছেন, তাহা এই দ্বিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্যান্য অধ্যায়েও "যুদ্ধ কর" এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্ মধ্যে মধ্যে আপনার বাক্যের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। ইহাই বোধ হয় যে, যে কৌশলে গ্রন্থকার এই ধর্ম্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সম্বদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক অনুভূত করিতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নতুবা যুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধপক্ষ সমর্থনকে উপলক্ষ্য করিয়া সমস্ত মনুষ্যধর্ম্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই ইহার উদ্দেশ্য।

এই কথাটা বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণার্জ্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ। দুই পক্ষের সেনা ব্যূহিত হইয়া পরস্পরকে প্রহার করিতে উদ্যত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপতি উভয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অষ্টাদশ অধ্যায় যোগধর্ম্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা বড় সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করা যাউক না যাউক, পাঠকের আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

(১) গীতায় ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু, গীতাগ্রন্থখানি ভগবৎপ্রণীত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা।

(২) যে ব্যক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণার্জ্জুনের কথোপকথনকালে সেখানে উপস্থিত থাকিয়া সকলই স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বসিয়া

সব লিখিয়াছিলেন, বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছিলেন, এমন কথাও বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং যে সকল কথা গীতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনেক কথা যে গ্রন্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির করিতেছেন, ইহা সম্ভব।

যাঁহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহর্ষি ব্যাস-প্রণীত, তিনি যোগবলে সর্ব্বজ্ঞ এবং অভ্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্ত্তব্য, তাঁহাদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিচার হইতে পারে না। সে শ্রেণীর পাঠকের জন্য এই ব্যাখ্যা প্রণীত হয় নাই, ইহা আমার বলা রহিল।

(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোক পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য প্রণীত হইবার পর কোন শ্লোক গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাঁহার ভাষ্যের সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের ঐক্য আছে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের অন্যূন সহস্র বা ততোধিক বৎসর পূর্ব্বেও গীতা প্রচলিত ছিল। এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহা কি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন শ্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই বোধ হয়।

এই সকল কথা স্মরণ না রাখিলে আমরা গীতার প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিব না। এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বলিয়া রাখিলাম। এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইতেছেন, সে সকল কথার সার মর্ম্ম কি?

আমরা উনবিংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালীতে সংক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্ম্যতা বুঝাইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন করেন নাই, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কথার স্থূল মর্ম্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্ম্মপালন করা কর্ত্তব্য।

আগে আমাদিগের বুঝিয়া দেখা চাই যে, স্বধর্ম্ম সামগ্রীটা কি?

শঙ্করাদি পূর্ব্বপণ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল। অর্জ্জুন ক্ষত্রিয়, সুতরাং অর্জ্জুনের স্বধর্ম্ম ক্ষাত্রধর্ম্ম বা যুদ্ধ। তিনি যে যুদ্ধ না করিয়া বরং বলিতেছিলেন যে, "ভিক্ষাবলম্বন করিব, সেও ভাল," সেটা তাঁহার পরধর্ম্মাবলম্বনের ইচ্ছা—কেন না, ভিক্ষা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।*

---

* শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্‌যুদ্ধাদুপররাম পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে।—শঙ্করভাষ্য।

কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুঝিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণের স্বধর্ম্ম বর্ণবিভাগানুসারে নির্ণীত হইতে পারে, ইহা যেন বুঝিলাম। কিন্তু অহিন্দুর পক্ষে স্বধর্ম্ম কি? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতি ক্ষুদ্রাংশ—অধিকাংশ মনুষ্য চতুর্ব্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধর্ম্ম নাই? জগদীশ্বর কি তাহাদের কোন ধর্ম্ম বিহিত করেন নাই? কোটি কোটি মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল ভারতবাসীর জন্য ধর্ম্ম বিহিত করিয়া আর সকলকেই ধর্ম্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত ধর্ম্ম কি হিন্দুর জন্যই? ম্লেচ্ছেরা কি তাঁহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম্ম এমন অনুদার নহে।

যিনি স্বয়ং জগদীশ্বরের এইরূপ ধর্ম্মচ্যুতিতে বিশ্বাসবান্, তিনি খ্রীষ্টিয়ানের* তুল্য। আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান্ নহেন, তিনি "স্বধর্ম্মের" অন্য তাৎপর্য্যের অনুসন্ধান করিবেন সন্দেহ নাই।

যাহার যে ধর্ম্ম, তাহার তাই স্বধর্ম্ম। এখন মনুষ্যের ধর্ম্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কি লইয়া মনুষ্যত্ব? মানুষের শরীর আছে, এবং মন† আছে। এই শরীরই বা কি? এবং মনই বা কি? শরীর কতকগুলি জড়পদার্থের সমবায়, তাহাতে কতকগুলি শক্তি আছে। এই শক্তিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে, মনুষ্যত্ব থাকে না; কেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। তবেই জড়-পদার্থকে ছাড়িয়া দিতে হইবে—সেই দৈহিকী শক্তিগুলিই মনুষ্যশরীরের প্রকৃত উপাদান। আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছি—"শারীরিকী বৃত্তি"। মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি বা বৃত্তির সমষ্টি। সেইগুলির নাম দেওয়া যাউক, মানসিক বৃত্তি। এখন দেখা যাইতেছে যে, এই শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি লইয়াই মানুষ, বা মানুষের মানুষত্ব।

যদি তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্তিগুলির বিহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম্ম।

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা কি করি? হয় কিছু কর্ম্ম করি, না হয় কিছু জানি। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই।‡

---

* খ্রীষ্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীশুখ্রীষ্ট না ভজে জগদীশ্বর তাহাকে অনন্তকাল জন্য নরকে নিক্ষেপ করেন।

† "মন" চলিত কথা, এই জন্য "মন" শব্দ ব্যবহার করিলাম। এই চলিত কথাটি ইংরেজী "mind" শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দুদর্শনশাস্ত্রের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্ত্তে বুদ্ধি ও মন উভয় শব্দ, এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। তাহার পরিবর্ত্তে "matter and mind" এই বিভাগের অনুবর্ত্তী হওয়াই ভাল।

‡ কোম্‌ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন, "Thought, Feeling, Action," ইহা ন্যায্য। কিন্তু Feeling অবশেষে Thought কিম্বা Action প্রাপ্ত হয়। এই জন্য পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম্ম এই দ্বিবিধ বলাও ন্যায্য।

অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম মানুষের স্বধর্ম্ম। সকল বৃত্তিগুলি সকলেই যদি বিহিতরূপে অনুষ্ঠিত করিত, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েই সকল মনুষ্যেরই স্বধর্ম্ম হইত। কিন্তু মনুষ্য-সমাজের অপরিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়া উঠে না।* কেহ কেবল জ্ঞানকেই প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্থানীয় করেন, কেহ কর্ম্মকে ঐরূপ প্রধানতঃ স্বধর্ম্মস্বরূপ গ্রহণ করেন।

জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জ্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়। ব্রাহ্মণ শব্দ ব্রহ্মন্ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

কর্ম্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা বুঝিতে গেলে কর্ম্মের বিষয়টা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। জগতে অন্তর্ব্বিষয় আছে ও বহির্ব্বিষয় আছে। অন্তর্ব্বিষয় কর্ম্মের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, বহির্ব্বিষয়ই কর্ম্মের বিষয়। সেই বহির্ব্বিষয়ের মধ্যে কতকগুলিই হউক অথবা সবই হউক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্যের কর্ম্ম মনুষ্যের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ত্রিবিধ, যথা (১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (১) যাহারা উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধর্ম্মী; (২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাণিজ্য ধর্ম্মী; এবং (৩) যাহারা রক্ষা করে, তাহারা যুদ্ধধর্ম্মী। ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এ কথা পাঠক স্বীকার করিতে পারেন কি?

স্বীকার করিবার প্রতি একটা আপত্তি আছে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে এবং এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শূদ্রের ধর্ম্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়ই বৈশ্যের ধর্ম্ম। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার দিনে প্রধানতঃ শূদ্রেরই ধর্ম্ম। যখন জ্ঞানধর্ম্মী, যুদ্ধধর্ম্মী, বাণিজ্যধর্ম্মী বা কৃষিধর্ম্মীর কর্ম্মের এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধর্ম্মিগণ আপনাদিগের দৈহিকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হয়। অতএব (১) জ্ঞানার্জ্জন বা লোকশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পরিচর্য্যা, এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম।

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম্ম পুরুষপরম্পরাগত। কেবল হিন্দুসমাজেই যে এরূপ, তাহা নহে, হিন্দুসমাজসংলগ্ন মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ ঘটিয়াছে। দরজিরা

* আমি উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি।

পুরুষানুক্রমে সিলাই করে, জোলারা পুরুষানুক্রমে বস্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে তৈল বিক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একটা দোষ ঘটে এই যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, তখন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, কর্ম্মান্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। প্রাচীনকালের অপেক্ষা এ কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে।* এজন্য শূদ্র এখন কেবল পরিচর্য্যা ছাড়িয়া কৃষিধর্ম্মী। পক্ষান্তরে পূর্ব্বকালে আর্য্য-সমাজস্থ অধিকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষিধর্ম্মী ছিল। এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্য।

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কর্ম্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক্, শিল্পী, কৃষক, বা পরিচারকধর্ম্মী। সামাজিক অবস্থার গতি দেখিয়া যদি বল যে, মনুষ্য মাত্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র, তাহাতেও কোন আপত্তি হইতে পারে না। স্থূল কথা এই যে, এই ষড়্বিধ বা পঞ্চবিধ বা চতুর্ব্বিধ কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যের কর্ম্মান্তর নাই। যদি থাকে, তাহা কুকর্ম্ম।† এই ষড়্বিধ কর্ম্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম, তাঁহার Duty. তাহাই তাঁহার স্বধর্ম্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্ম্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদুক্তিকে অতি সঙ্কীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান্ কখনই সঙ্কীর্ণ-বুদ্ধি নহেন।

যাহা ভগবদুক্তি,—গীতাই হউক, Bibleই হউক, স্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখ-নির্গতই হউক, বা তাঁহার অনুগৃহীত মনুষ্যের মুখনির্গতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, উহা তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয়। কিন্তু সমাজের অবস্থা এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হয়। তখন ভগবদুক্তির ব্যাখ্যারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয়। কেন না, ধর্ম্ম নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধও নিত্য।

---

* কেবল কালসহকারে প্রজাবৃদ্ধির কথা বলিতেছি না। "বাঙ্গালির উৎপত্তি" বিষয়ে বঙ্গদর্শনে যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি যে, অনার্য্য জাতিবিশেষসকল হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দু শূদ্রজাতি-বিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা, পুণ্ড্র নামক প্রাচীন অনার্য্য জাতি বিশেষ এখন কোন স্থানে পুঁড়া, কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে কালক্রমে শূদ্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসঙ্কর শূদ্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

† যথা চৌর্য্যাদি।

ঈশ্বরোক্ত ধর্ম্ম যে কেবল একটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক অবস্থার পক্ষেই ধর্ম্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পূর্ব্বাবস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহা কখন ঈশ্বরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না। কালক্রমে সামাজিক পরিবর্ত্তনানুসারে ঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোগিনী ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। কৃষ্ণোক্ত স্বধর্ম্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্ম্মও আছে; আমি যাহা বুঝাইলাম তাহাও আছে, কেন না, উহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের সম্প্রসারণ মাত্র। তবে প্রাচীনকালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়; আমি যেরূপ বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়।

স্বধর্ম্ম কি, তাহা যদি, যাহা হউক এক রকম, আমরা বুঝিয়া থাকি, তবে এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন কেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ব্বক এ তত্ত্ব অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন। একটি জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্ম্মমার্গ। এই অধ্যায়ে দ্বাদশ শ্লোক হইতে আটত্রিশ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানমার্গ কীর্ত্তন, তৎপরে কর্ম্মমার্গ।

জ্ঞানমার্গের স্থূল তত্ত্ব আত্মা অবিনশ্বর পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে।

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্‌ ॥ ১২ ॥

আমি কদাচিৎ ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এঁই রাজগণ ছিলেন না, এমন নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকিব না, এমন নহে। ১২।

যুদ্ধে স্বজন-নিধন-সম্ভাবনা দেখিয়া অর্জ্জুন অনুতাপ করিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ ইহার পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, "যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ" যে মরিবে, তাহার জন্য শোক করা উচিত নহে কেন, তাহা এই শ্লোকে বুঝাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, "দেখ, কেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি, আর এই রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্ব্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর সবাই থাকিবে। যদি থাকিবে, মরিবে না, তবে তাহাদের জন্য শোক করিবে কেন?"

ইহাই হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা—হিন্দুধর্ম্মান্তর্গত প্রধান তত্ত্ব। কেবল হিন্দুধর্ম্মের নহে, খ্রীষ্টধর্ম্মের, বৌদ্ধধর্ম্মের, ইস্‌লামধর্ম্মের, সকল ধর্ম্মের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ত্ব। সে তত্ত্ব এই যে, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী। শরীরের ধ্বংস হইলেও আত্মা পরকালে বিদ্যমান থাকে। পরকালে আত্মার কি অবস্থা হয়, তদ্বিষয়ে নানা

মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্তু দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, এবং
তিনি বিনাশ-শূন্য, অমর, ইহা হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, মুসলমান প্রভৃতি সকলের
সম্মত। এই সকল ধর্ম্মের ইহাই মূলভিত্তি।

এই তত্ত্বের প্রধান প্রতিবাদী বৈজ্ঞানিকেরা। তাঁহারা বলেন, শরীরাতিরিক্ত আর
কিছু নাই। শরীরাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই।

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই বড় বলবান্। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম এক দিকে, তাঁহারা আর
এক দিকে। তাঁহাদের প্রচণ্ড প্রতাপে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্ম হঠিয়া যাইতেছে। অথচ
বিজ্ঞানের * অপেক্ষা ধর্ম্ম বড়। পক্ষান্তরে ধর্ম্ম বড় বলিয়া আমরা বিজ্ঞানকে পরিত্যাগ
করিতে পারি না। ধর্ম্মও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য। অতএব এস্থলে আমাদের বিচার
করিয়া দেখা যাউক, কতটুকু সত্য কোন্ দিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী,
বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট। বিজ্ঞানে রেলওয়ে
টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, কাপড় হয়, নানা রকমে টাকা আসে, অতএব
বিজ্ঞানই তাঁহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ। যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা
যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত।

এ বিচারে আগে বুঝা কর্ত্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা
আত্মাকে কিরূপ বুঝে।

হিন্দু দার্শনিকেরা আত্মাকে বলেন, "অহম্প্রত্যয়বিষয়াস্পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ"—
অর্থাৎ "আমি" বলিলে যাহা বুঝিব, সেই আত্মা। এ সম্বন্ধে আমি পূর্ব্বে যাহা লিখিয়াছি,
তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র।

"আমি দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু আমি কে? বাহ্য-প্রকৃতি ভিন্ন আর কিছু
তোমাদের ইন্দ্রিয়ের গোচর নহে। তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি—আমি বড়
সুখী। কিন্তু একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন "তুমি" বলিব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না।
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রক্রিয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগোচর। তবে কি তোমার
দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বলিব?

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু তৎকালে তাহার
সুখ দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে
অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী। তবে তোমার

* পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রচলিত প্রথানুসারে Scienceকেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব।

দেহ দুঃখভোগ করে না। যে দুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি। তোমার দেহ তুমি নহে।

এইরূপ সকল জীবের। অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইন্দ্রিয়-গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে, এবং সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা। যে সুখ দুঃখাদির ভোগকর্ত্তা, সেই আত্মা।" *

আত্মতত্ত্ব বিষয়ক, এই স্থূল কথাটা খ্রীষ্টিয়াদি সকল ধর্ম্মেই আছে। কিন্তু তাহার উপর আর একটা অতি সূক্ষ্ম, অতি চমৎকার কথা, কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে। সেই তত্ত্ব অতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বাসমাত্রে মনুষ্যজন্ম সার্থক হয়। হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সেই অতি মহত্তত্ত্ব অনুভূত করিতে পারে নাই। যে সকল কারণে, হিন্দুধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি অতি গুরুতর কারণ। সেই তত্ত্ব এখন বুঝাইতেছি।

আত্মা সকলেরই আছে। তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা হইতে কাজেই ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নহে। মনে কর, বহুসংখ্যক শূন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলির ভিতর আকাশ আছে। এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ আকাশ পাত্রান্তরস্থ আকাশ হইতে ভিন্ন। কিন্তু পৃথক্ হইলেও সকল পাত্রস্থ আকাশ জাগতিক আকাশের অংশ। পাত্রগুলি ভগ্ন করিলেই আর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবগত আত্মা পরস্পর পৃথক্ হইলেও জাগতিক আত্মার অংশ; দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বিলীন হয়। এই জগদাত্মাকে হিন্দু-দার্শনিকেরা পরমাত্মা বলেন। জীবদেহস্থায়ী আত্মা যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন না হয়, তত দিন তাহাকে জীবাত্মা বলেন।

এখন এই জীবাত্মা কি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই কি তাহার ধ্বংস হইল? ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহা অবিনশ্বরের অংশ, তাহা কখন নশ্বর হইতে পারে না। যদি জাগতিক আকাশ অবিনশ্বর হয়, তবে ভাণ্ডস্থ আকাশও অবিনশ্বর। যদি পরমাত্মা অবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জীবাত্মাও অবিনশ্বর।

এই হইল হিন্দুধর্ম্মের কথা। অন্য কোন ধর্ম্ম এই অত্যুন্নত তত্ত্বের নিকটেও আসিতে পারেন নাই। আমরা পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষা উন্নত তত্ত্ব মনুষ্যজ্ঞাত তত্ত্বের ভিতর

* প্রবন্ধ পুস্তক।

আর নাই বলিলেও হয়। প্রাচীন ঋষিরা বলিতে পারেন, "আমরা যদি আর কিছু না করিতাম, কেবল এই কথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও আমরা সকল মনুষ্যের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম।" * বাস্তবিক এই সকল তত্ত্বের আলোচনা করিলে তাঁহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না; দেবতা বলিতেই ইচ্ছা করে।

এখন দেখা যাউক, বৈজ্ঞানিকেরা এ সম্বন্ধে কি বলেন। তাঁহারা বলেন, আদৌ আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বীকার কর্ত্তব্য নহে। যখন আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগদ্বিখ্যাত লেখক, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপত্তি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন।

"Thought and consciousness, though mentally distinguishable from the body, may not be a substance separable from it, but a result of it, standing in relation to it, like that of a tune to the musical instrument on which it is played; and that the arguments used to prove that the soul does not die with the body, would equally prove that the tune does not die with the instrument but survives its destruction and continues to exist apart. In fact, those moderns who dispute the evidences of the immortality of the soul, do not in general believe the soul to be a substance *per se*, but regard it as a bundle of attributes, the attributes of feeling, thinking, reasoning, believing, willing and these attributes they regard as a consequence of the bodily organization which therefore, they urge, it is as unreasonable to suppose surviving when that organization is dispersed, as to suppose the colour or odour of a rose surviving when the rose itself has perished. Those, therefore, who would deduce the immortality of the soul from its own nature have first to prove that the attributes in question are not attributes of the body, but of a separate substance." †

এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুঝিয়া দেখুন। এই বিচারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব অসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার অনস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না। আত্মা নাই, এমন কথা মিল কি কেহই বলিতে পারেন না। উক্ত বিচারে যে আত্মার অনস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন।

---

* যে তত্ত্বটা বুঝাইলাম, তাহা যে বিলাতী Pantheism নয়, এ কথা বোধ হয় বলিবার প্রয়োজন নাই।

† *Three Essays on Religion*, p. 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা লেখা যাইতেছে, সুতরাং ইংরেজির তরজমা দেওয়া যাইবে না।

"In the first place, it does not prove, experimentally, that any mode of organization has the power of producing feeling or thought. To make that proof good, it would be necessary, that we should be able to produce an organism, and try whether it would feel, which we cannot do."

পুনশ্চ—

"There are thinkers who regard it as a truth of reason that miracles are impossible; and in like manner there are others who, because the phenomena of life and consciousness are associated in their minds by undeviating experience with the action of material organs, think it an absurdity *per se* to imagine it possible those phenomena can exist under any other conditions. But they should remember that the uniform co-existence of one fact with another does not make the one fact a part of the other or the same with it. The relation of thought to a material brain is no metaphysical necessity; but simply a constant co-existence within the limits of observation. And when analysed to the bottom on the principles of the associative Psychology, just as much as the mental functions, is, like matter itself, merely a set of human sensations either actual or inferrible as possible......Experience furnishes us with no example of any series of states of consciousness without this group of contingent sensations attached to it; but it is as easy to imagine such a series of states without, as with, this accompaniment, and, we know of no reason in the nature of things against the possibility of its being thus disjoined. We may suppose that the same thoughts, emotions, volition and even sensations which we have here, may persist or recommence somewhere else under other conditions, just as we may suppose that other thoughts and sensations may exist under other conditions in other parts of the universe. And in entertaining this supposition we need not be embarrassed by any metaphysical difficulty about a thinking substance. Substance is but a general name for the perdurability of attributes; wherever there is a series of thoughts connected together by memories, that constitutes a thinking substance."

জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়া গেল, তাহার চিহ্নমাত্র রহিল না। তথাপি ইহাতেই আত্মবাদী জয়ী হইতেছেন না। পৃথক্ আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা বলিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল। কিন্তু আত্মা যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা অবিনাশী, ইহা প্রমাণীকৃত হইল না। তুমি বলিতেছ, স্বতন্ত্র আত্মা আছে, এবং তাহা অবিনাশী, এ কথার প্রমাণ কি?

অনেক সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহীত হইয়া আসিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অপ্রচুর বলিয়া উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিকেরা

সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহারা সুবিচারক। অতএব তাঁহারা এ কথা কেন বলেন, সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই।

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ। আমি এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতেছি বলিয়াই, জানিতে পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে পুষ্পের অস্তিত্বের প্রমাণ। আমি গৃহমধ্যে শয়ন করিয়া মেঘগর্জ্জন শুনিলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। কিন্তু মেঘের ধ্বনি আমার প্রত্যক্ষের * বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার কারণ পূর্ব্বকৃত প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান। যখনই যখনই এইরূপ গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করা গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে।

অতএব আমরা দ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি (১) প্রত্যক্ষ, (২) অনুমান। ভারতবর্ষীয়েরা অন্যবিধ প্রমাণও স্বীকার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক বা জড়বাদিগণ অন্য কোন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁহারা অনুমান সম্বন্ধে ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ; অথবা এরূপ অনুমান হইতেই পারে না। এই তত্ত্বের মীমাংসা জন্য ইউরোপীয়েরা এক অতি বিচিত্র এবং মনোহর দর্শনশাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই।

এখন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্মা কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় হয় নাই। শরীর প্রত্যক্ষ, কিন্তু শরীরস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই। শরীর-বিমুক্ত আত্মারও কেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। যাহা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষমূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে। আত্মা ভিন্ন এমন অন্য কোন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্যের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজাত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নাই।†

---

* যাহা ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। পুষ্পের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল।

† তবে সর্ব্ব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, মৃত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয়। দেহ-বিমুক্তাত্মা এইরূপে মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে অবস্থাবিশেষে ভূত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এ সকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসের কারণ। কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় Spiritualism তত্ত্বের প্রাদুর্ভাবে, এই প্রেততত্ত্বই বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; এবং Crookes, Wallace প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা এতদ্বিষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমরূপে পরীক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে,

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুঁজিয়া পায় না। বিজ্ঞান সত্যবাদী। বিজ্ঞানের যত দূর সাধ্য, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাইল না কেন, না বিজ্ঞানের তত দূর গতিশক্তি নাই। যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে না। ডুবুরী কোমরে দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে না, সাগরে সমস্ত রত্ন কুড়াইবার তার সাধ্য নাই। প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে বাঁধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ত্ব পাইবে কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌঁছে না, সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিম্ন সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম। "Our victorious Science fails to sound one fathom's depth on any side, since it does not explain the parentage of *mind*.* For mind was in truth before all science, and remains for ever, the seer, judge, interpreter, even father of all its systems, facts, and laws. Our faculties are none the less truly above our heads because we no longer wonder like children at processes we do not understand. Spite of category and formula of Kant and Hegel, we are abashed before our own untraceable thought. The star of heaven, the grass of the field, the very dust that shall be man, foil our curiosity as much as ever, and none the less for yielding to the lens, the prism and the polariscope of science ever now triumphs for our pride and delight."† যখন বিজ্ঞান একটি ধূলিকণার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না,‡ তখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করিবে কি প্রকারে? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না। যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই।

প্রতিপক্ষেরা কিছু গোলযোগে পড়িয়াছেন। ইহার নানা প্রকার বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপ্রত্যক্ষের যাথার্থ্য এখনও বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের মধ্যে আমি গণনা করিতে পারিলাম না। আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করি না। ধর্ম্ম বিজ্ঞান নহে; তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়সংস্থাপিত।

* আত্মা।

† Oriental Religions, India, p. 447.

‡ কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মতে বহির্জ্জগতের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই।

এখন, বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে। যখন বলিতেছ, জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই নাই। আত্মতত্ত্ব যখন প্রমাণের অতীত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্মসম্বন্ধে মনুষ্যের কোন জ্ঞান নাই, ও হইতে পারে না। অতএব আত্মা আছে কি না জানি না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বলিবার উপায় নাই।

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকদিগের উত্তর, একটি আধুনিক জর্ম্মাণদিগের উত্তর। দর্শনশাস্ত্রে এই দুইটি জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। এই দুই জাতিই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার গতিশক্তি অতি সঙ্কীর্ণ, তাহা কখনই মনুষ্য-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু দার্শনিকেরা অন্যবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকেরা বলেন, আর দ্বিবিধ প্রমাণ আছে, উপমান এবং শাব্দ। সাংখ্যেরা উপমান স্বীকার করেন না, কিন্তু শাব্দকে তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন।

উপমান (Analogy) যে একটি পৃথক্ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার করিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান জন্মে। যেখানে উপমান প্রমাণের কার্য্য করে, সেখানে উহা পৃথগ্‌বিধ প্রমাণ নহে, অনুমানবিশেষ মাত্র। এক্ষণে "শাব্দ" কি, তাহা বুঝাইতেছি।

আপ্তোপদেশই শাব্দ, অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য যে বাক্য তাহাই তৃতীয় প্রমাণ। যদি বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহা প্রমাণ। যদি বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। পরন্তু বেদাদি যদি মনুষ্যোক্তি হয়, তবে উহা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না, কেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমপ্রমাদাদির অধীন। স্থূল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ। যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাব্দরূপ প্রমাণ। খ্রীষ্টিয়ানেরাও ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন—ইংরাজি নাম Revelation. বস্তুত যদি কোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কেন না, প্রত্যক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর কখনই ভ্রান্ত হইতে পারেন না। যদি এই গীতাকে কাহারও ঈশ্বরোক্তি বলিয়া বিশ্বাস হয়, তবে আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা সম্বন্ধে

তাঁহার অন্য প্রমাণ খুঁজিবার প্রয়োজন নাই; এই গীতাই অখণ্ডনীয় প্রমাণ। তবে নিরীশ্বর বৈজ্ঞানিক, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য নহেন?

তাঁহাদিগের জন্য জর্ম্মাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। কাণ্টের বিচিত্র দর্শনশাস্ত্র পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই। কিন্তু কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কতকগুলি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন, কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল "বলেন" ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য্য পরিচয়স্থল। কাণ্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বুদ্ধি বলি, অর্থাৎ যে শক্তির দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষাদি হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান লইয়া বিচার করি, তাহার অপেক্ষা উচ্চতর আমাদের আর এক শক্তি আছে। যাহা বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে আমরা তাহা জানিতে পারি। ঈশ্বর, আত্মা, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা সেই মহতী শক্তি হইতে পাই। এই "Transcendental Philosopy," সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। অতএব এমন লোক অনেক আছেন যে, আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনশ্বরিতায় বিশ্বাস তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। তবে যাহা, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহা আমি এখানে বলিতে বাধ্য। আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, **চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হইলে, আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।***

ভক্তের এ সকল কচকচিতে কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বরভক্ত, কেবল ক্ষুদ্র দর্শন-শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না। ভক্তের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা এবং স্বয়ংই সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন। তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম, তাহার কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্ত্বকে উপহসিত করেন। তাঁহাদের জানা উচিত যে, আত্মতত্ত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতীত হউক, বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ নহে।

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

---

* অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জ্জিত হয় নাই? উত্তর—না, সকলগুলি হয় নাই।

দেহীর যেমন এই দেহে কৌমার ও যৌবন ও বার্দ্ধক্য, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তি। পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩।

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই শ্লোকে দ্বিতীয় প্রধান তত্ত্ব কথিত হইতেছে—জন্মান্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহান্তরপ্রাপ্তি অবস্থান্তর-প্রাপ্তি মাত্র। অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন কৌমার গেলে যৌবন উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে;—যেমন কৌমার গিয়া যৌবন আসিলে কেহ শোক করে না, যৌবন গিয়া জরা আসিলে কেহ শোক করে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহান্তরপ্রাপ্তির বেলাই বা কেন শোক করিব?

এই কথায়, মানিয়া লওয়া হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে। আত্মার অবিনাশিতা যেমন হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি দ্বিতীয় তত্ত্ব। কিন্তু আত্মার অবিনাশিতা যেমন খ্রীষ্টিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্ম্মে স্বীকৃত, জন্মান্তরবাদ সেরূপ নহে। পক্ষান্তরে জন্মান্তরবাদ যে কেবল হিন্দুধর্ম্মেই আছে, এমনও নহে। বৌদ্ধধর্ম্মেরও ইহা প্রধান তত্ত্ব, এবং অন্যান্য ধর্ম্মেও ছিল বা আছে। তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহ্য এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালি এ মত গ্রাহ্য করেন না।

বাস্তবিক আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর সম্বন্ধেও তদ্রূপ কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে যেমন আত্মার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করা যায় না, জন্মান্তরও অপ্রমাণ করা যায় না। তা না যাক্, যাহার প্রমাণাভাব তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। এই তত্ত্বে বিশ্বাস যে চিত্তবৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলনে স্বতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আমি বলিতে পারি না। তবে যিনি স্বর্গ নরকাদি মানেন, জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাঁহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জন্মান্তরবাদের আপ্তোপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরকাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়দিগের দেখাদেখি প্রমাণাভাবেও স্বর্গনরকে বিশ্বাসবান্—অর্থাৎ সুখ-দুঃখ-যুক্ত পারলৌকিক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসবান্, কিন্তু জন্মান্তরে কোন মতেই বিশ্বাসবান্ নহেন।

কথাটা একটু সবিস্তারে সমালোচনা করিবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। যিনি আত্মার অস্তিত্ব মানেন না, তাঁহার সঙ্গে ত আমাদের কথাই নাই, কেন না, তিনি

কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্তু যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা মানেন, তাঁহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতেই উপস্থাপিত হয়।

জীবাত্মা যদি অবিনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার কি গতি হয়?

এ বিষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে।

১। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতিদিগের বিশ্বাস।

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয়। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানদিগের এই মত।

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধদিগের এই মত।

৪। পরব্রহ্মে লীন হয়, বা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

হিন্দুধর্ম্মে শেষোক্ত এই তিনটি মতই প্রচলিত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দুরা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত হয় না; আপনার কৃত কর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার দেহান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার আবার জন্মান্তর হয়। যখন জীবাত্মা এমন অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, ঈশ্বরে লীন হইবার যোগ্য হইয়াছে, তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় বা নির্ব্বাণপ্রাপ্তি হয়। ইহাকেই সচরাচর মুক্তি বা মোক্ষ বলে। কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাদি দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, যখন জীবাত্মা মুক্ত হইবার অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে, স্বর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্মা কৃত পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী কাল, স্বর্গাদি উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়।

আপাততঃ শুনিলে এ সকল কথা পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু একটু বিচার করিলে আর এক রকম বোধ হইবে।

এই জন্মান্তরবাদ, হিন্দুধর্ম্মে অতিশয় প্রবল। উপনিষদুক্ত হিন্দুধর্ম্ম, গীতোক্ত হিন্দুধর্ম্ম, পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বা দার্শনিক হিন্দুধর্ম্ম, সকল প্রকার হিন্দুধর্ম্ম ইহার উপর স্থাপিত। যেমন সূত্রে মণি গ্রথিত থাকে, হিন্দুধর্ম্মের সকল তত্ত্বগুলিই তেমনি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। অতএব এই তত্ত্বটি আমাদিগকে বড় যত্নপূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। কথাটাও বড় গুরুতর,—অতি দুরূহ। আমরা বাল্যকাল হইতে কথাটা শুনিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, সুতরাং আমরা সচরাচর ইহার গৌরব অনুভব করি না। কিন্তু বিদেশীয় এবং অন্যধর্ম্মাবলম্বী চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা কুসংস্কারবর্জ্জিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েন। গীতার অনুবাদকার টমসন সাহেব এতৎসম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "Undoubtedly it is the most novel and startling idea ever

started in any age or country." টেলর সাহেব ইহাকে "One of the most remarkable developments of ethical speculation" বলিয়া প্রশংসিত করিয়াছেন।*

কথাটা যদি এমনই গুরুতর, তবে ইহা আর একটু ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

বলা হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহা হিন্দুশাস্ত্রের উক্তি। পরমাত্মা বা পরব্রহ্মের অংশ তাঁহা হইতে পার্থক্যলাভ করিল কি প্রকারে? তাঁহার দেহবদ্ধাবস্থা বা কেন? হিন্দুশাস্ত্রে ইহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতেছি। ঈশ্বরের অশেষ প্রকার শক্তি আছে। একটি শক্তির নাম মায়া। এই মায়া কি, তাহা স্থানান্তরে বুঝাইব। এই মায়ার দ্বারা তিনি আপনার সত্তাকে জগতে পরিণত করিয়াছেন। তিনি চৈতন্যময়; তাঁহা ভিন্ন আর চৈতন্য নাই; অতএব জগতে যে চৈতন্য দেখি, ইহা তাঁহারই অংশ; তাঁহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশ মায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্ ও দেহবদ্ধ হইয়াছে। যদি সেই পৃথগ্‌ভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকিবে কেন? পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে, জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে।

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জীবাত্মা এই মায়াকে অতিক্রম করিবে কি প্রকারে? যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা নিয়োগ ক্রমেই বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে আবার বিমুক্ত হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে, ঈশ্বরের নিয়োগ এরূপ নহে যে, জীবাত্মা চিরকালই মায়াবদ্ধ থাকিবে। তিনি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার অতিক্রমের উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন। সে উপায় কি, তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ বলেন জ্ঞানেই সেই মায়াকে অতিক্রম করা যায়; কেহ বলেন কর্ম্মে, কেহ বলেন ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, বা কোন্‌টি অসত্য, তাহার বিচার পশ্চাৎ করা যাইবে। এখন সকলগুলিই সত্য, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক। এখন, এইগুলিই যদি ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে ব্যক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, কর্ম্ম, বা ভক্তির সমুচিত অনুষ্ঠান করে নাই, সে ঈশ্বরে লয় বা মুক্তি লাভ করিবে না। তবে সে ব্যক্তির আত্মা, মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে? আত্মা অবিনশ্বর; সুতরাং দেহভ্রষ্ট আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে।

* *Primitive Culture*, vol. I, p. 12.

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্রষ্ট আত্মা কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে যাইবে। স্বর্গ বা নরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্তিত্বের প্রমাণাভাব। কিন্তু প্রমাণের কথা এখন থাক। স্বীকার করা যাউক, কর্ম্মফলানুসারে আত্মা স্বর্গে বা নরকে যায়। এখন জিজ্ঞাস্য যে, জীবাত্মা স্বর্গে বা নরকে কিয়ৎকালের জন্য যায়, না অনন্তকালের জন্য যায়?

যদি বল কিয়ৎকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় যাইবে? জন্মান্তর স্বীকার না করিলে, এ প্রশ্নের উত্তর নাই। হয়, বল যে, জীব কর্ম্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ করিয়া, পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিবে, নয়, বল যে, অনন্তকাল সে স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে।

খ্রীষ্টিয়ানেরা তাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার করিয়া পাপীকে অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্‌কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন।

এ কথায় বড় গোলমালে পড়িতে হয়। মনুষ্যলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন সৎ কর্ম্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কর্ম্ম কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, কিছু পুণ্য করে। এখন জিজ্ঞাস্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহার পুণ্যের পুরস্কার হইল না কেন?

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, সে অনন্ত নরকে, যাহার পুণ্যের ভাগ বেশী, সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে। তাহা হইলেও ঈশ্বরে অবিচার আরোপ করা হইল। কেন না, তাহা হইলে, এক পক্ষে পুণ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এক পক্ষে পাপের কিছুই দণ্ড হইল না।

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ করা হয় এমত নহে। ঘোরতর নিষ্ঠুরতা আরোপ করাও হয়। যাঁহাকে দয়াময় বলি, তিনি যে এই অল্পকাল পরিমিত মনুষ্যজীবনে কৃত পাপের জন্য অনন্তকালস্থায়ী দণ্ড বিধান করিবেন, ইহার অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্ঠুরতা আর কি আছে? ঈদৃশ নিষ্ঠুরতা ইহলোকের পামরগণের মধ্যেও পাওয়া যায় না।

যদি বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পুণ্যের ভাগ কম, সে পুণ্যানুরূপ কাল স্বর্গভোগ করিয়া অনন্তকাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তদ্বিপরীতে বিপরীত ফল হইবে; তাহাতেও ঐ সকল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পরিমিত কাল, কোটি কোটি যুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে। অবিচার ও নিষ্ঠুরতার লাঘব হইল, এমন হইতে

পারে, অভাব হইল না। অতএব তুমি যদি স্বর্গ নরক স্বীকার কর, তবে তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ বিহিত হইতে পারে না। তুমি ঊর্দ্ধ ইহাই বলিতে পার যে, পাপ পুণ্যের পরিমাণানুযায়ী পরিমিত কাল জীব স্বর্গ বা নরক, বা পৌর্ব্বাপর্য্যের সহিত উভয় লোক ভোগ করিবে। তাহা হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাকি থাকে। সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যাইবে? পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে না, কেন না, জ্ঞান কর্ম্মাদিই যদি মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনাভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। কেন না, স্বর্গ নরক ভোগ মাত্র—কর্ম্মক্ষেত্র নহে, এবং দেহশূন্য আত্মার জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান কর্ম্মের অভাব। অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পরিমিত কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়?

হিন্দুশাস্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,—জীবাত্মা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন করিয়া দেহান্তর ধারণ করে। হিন্দুধর্ম্মের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্ম্মের এই অভিপ্রায় যে, জীবাত্মা সচরাচর দেহধ্বংসের পর দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে। সেই দেহান্তর-প্রাপ্তিতে কর্ম্মফলানুসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসৎ যোনি প্রাপ্ত হয়। সচরাচর কর্ম্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম্ম এমন আছে যে, তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহাকে স্বর্গে বা নরকে যাইতে হইবে। কর্ম্মের ফলের পরিমাণানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিবে।

কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপত্তির এখনও নিরাস হয় নাই। সে বলিবে, "যাহা বলিলে, এটা সাফ আন্দাজি কথা। অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদৌ মানিতেছি না। কেন না, তাহার প্রমাণাভাব। কিন্তু স্বর্গ নরক না মানিলেই জন্মান্তর মানিব কেন? মানিলাম যে, আত্মা অবিনাশী। তুমি বলিতেছ যে, অবিনাশী আত্মা, যদি দেহান্তরে না যায়, তবে কোথায় যাইবে? আমি উত্তরে বলিব, কোথায় যায় তাহা জানি না। পরকালের কথা কিছুই জানি না। যাহা জানি না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাণাভাব, জন্মান্তরের প্রমাণ নয়। তুমি যে রামও নও, শ্যামও নয়, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব কি মাধব। জন্মান্তর যে হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি?"

কথা বড় শক্ত। জন্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সকল প্রমাণ দিয়া থাকেন, বা ইচ্ছা করিলে দিতে পারেন, তাহা আমি যথাসাধ্য নিম্নে সংগ্রহ করিলাম।

১। এ দেশে সচরাচর, লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন করা হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; কেহ সহস্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ জন্মান্তরের সুকৃত দুষ্কৃত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে অর্থাৎ স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুষ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বলিলে ইহলোকের অদৃষ্ট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। কেহ আজন্ম দুঃখী, অন্নহীনের ঘরে জন্মিয়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র পুত্র;—জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য কেন? যদি ইহা জীবের কর্ম্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কর্ম্মফল নহে, কেন না, সদ্যঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকৃত কর্ম্ম নাই। কাজেই তাঁহারা এখানে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মফল বিবেচনা করিয়া থাকেন।

আপত্তিকারক এ বিচারে সন্তুষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, "সকলই কি কর্ম্মফল? যদি তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্ম্মফল বলিতে হইবে। কিন্তু কখনও কোন জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই। অতএব ইহাই সিদ্ধ যে, এমন কোন কর্ম্ম বা অকর্ম্ম নাই, যদ্দ্বারা মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে। অতএব মৃত্যু কর্ম্মফল হইতে পারে না। মৃত্যু যদি কর্ম্মফল না হইল, তবে জন্মই বা কর্ম্মফল বলিব কেন? যাহা কর্ম্মফল আর যাহা কর্ম্মফল নহে, সকলই ঈশ্বরের নিয়মে ঘটে। ইহাও তাই। দম্পতি-সংসর্গে অবস্থা-বিশেষে পুত্র জন্মে, রাজার ঘরেও জন্মে; মুটের ঘরেও জন্মে। ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন স্থলে জাতব্যক্তির কর্ম্মফল খুঁজিব কেন?"

এখানেও বিচার শেষ হয় না। পূর্ব্বজন্মবাদী প্রত্যুত্তরে বলিতে পারেন, "ঈশ্বরের নিয়মের ফলে সকলই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার করি। তবে বলিতেছি যে, এ বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ব্বজন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি যে নিয়ম বলিতেছ, আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি—জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই জন্ম ঘটিবে —তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গর্ভেই কি? কিন্তু এ নিয়মে কি জন্মতত্ত্ব সকলই বুঝাইতে পার? কেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধি, সদ্গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে—কেহ কুরূপ, নির্ব্বোধ ও গুণহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে। তুমি যদি বল যে, এইরূপ প্রভেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্ত্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার উত্তর এই যে, শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতম্য ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না। কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রকার শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে।

এমন কি, শিক্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ লক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলিবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধীন বলিয়া বুঝা যায় না, সে তারতম্যটুকু বৈজিক, অর্থাৎ পিতা মাতা বা পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি ইহাও মানি যে, মাতা পিতা বা তৎপূর্ব্বগামী পূর্ব্বপুরুষগণের প্রকৃতি, এমন কি সংস্কার পর্য্যন্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যমধ্যে যে তারতম্যের কথা বলিতেছি, তাহা তোমার বৈজিক তত্ত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ঔরসে অনেকগুলি ভ্রাতা জন্মে ; তাহাদের মাতা পিতা বা পূর্ব্বপুরুষ সম্বন্ধে কোনই প্রভেদ নাই ; অথচ ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। ইহার উত্তরে তুমি বলিতে পার বটে যে, গর্ভাধানকালে মাতা পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে, তত দিন মাতার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনা সকল এই তারতম্যের কারণ। না হয় ইহাও মানিলাম—কিন্তু যমজেও এরূপ তারতম্য দেখা যায়—সে তারতম্যের কিছু কারণ নির্দ্দেশ করিতে পার কি ?”

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন। তিনি বলিতে পারেন যে, এই সকল তারতম্য এত দূর মনুষ্য-পরিজ্ঞাত নৈসর্গিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাকিটুকু মনুষ্যের জ্ঞেয় নিয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত—পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা অনাবশ্যক। এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা যায় ; কিন্তু একদিন যাইবে ভরসা করা যায়।

এ দিকে জন্মান্তরবাদীও বলিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজি কথা। যাহা বিজ্ঞান এখন বুঝাইতে পারিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুঝাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে বুঝাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা। ইহা আমি মানি না।

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, কোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক, জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদী বৈজ্ঞানিককে নিরস্ত করিতে পারেন না। উভয়ের দশা তুল্য হইয়া পড়ে। যাহা অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার আশ্রয় লইতে হয়। তবে জন্মান্তরবাদীকেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অপ্রামাণিকের আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার করিতে পারি না।

২। যাহাতে মনুষ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়, এমন কথা অনেকে বলেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী

মনুষ্যেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, নানা দেশে নানা জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্।*

বলা বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের প্রতীতিকর হইবে না। যাহা জনসাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সকল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ। যথা, পৃথিবী সূর্য্যাদির সম্বর্ত্তনকেন্দ্র।

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মার্জ্জিত জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা বিধূতপাপ হয়, তত দিন ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদুপযোগী চিত্তশুদ্ধি লাভ করে না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্তু গ্রীক দার্শনিকেরাও এই যুক্তির দ্বারা জন্মান্তরবাদের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা Phœdon নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উক্তি অধ্যয়ন করিবেন। বৈজ্ঞানিক বলিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব।

৪। অনেকের বিশ্বাস যে, যোগসিদ্ধ পুরুষেরা আপনাদিগের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারেন। কিন্তু কোন সিদ্ধপুরুষের যে এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। পুরাণেতিহাসের সকল কথা যে বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহা বলা বাহুল্য।† আর যদি কোন সিদ্ধপুরুষ যথার্থ ই বলিয়া থাকেন

* "It has been accepted, in some form, by disciples of every Great religion in the world. It is common to Greek philosophers, Egyptian priests, Jewish Rabbins and several early Christian sects. It appears in the speculations of the Neo-Platonists, of latter European mystics, even of socialists like Fourier, who elaborates a fanciful system of successive lines mutually connected by numerical relation. It reaches from the Eleusinian mysteries down to the religions of many rude tribes of North America and the Pacific isles. Not a few noble dreams of the cultivated imagination are subtly associated with it, as in Plato, Giordano Bruno, Herder, Sir Thomas Browne, and specially notable is Lessing's conception of gradual improvement of the human type through metamorphosis in a series of future lives." Oriental Religions : India. P. 517.

যিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, তিনি টেলর-প্রণীত "Primitive Culture" নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধ্যায় অধ্যয়ন করিবেন।

† কিন্তু ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পূর্ব্বজন্মস্মৃতির কথা বলেন।

"Pythagoras is made to illustrate in his own person his doctrine of metempsychosis, by recognizing where it hung in Here's temple the shield he had carried in a former birth, when he was that Euphorbas whom Menelaus slew at the siege of Troy. Afterwards he was Hermotunos, the Klazomenian prophet, whose funeral rites were so prematurely celebrated while his soul was out, and after that, as Lucian tells the story, his prophetic soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cook to tell him of the siege of Troy—were things there really as Homer has said? But the cock replies ;—"How should Homer have known, O Mikyllos, when the Trojan war was going on, he was a camel in Bactria."—Tylor's *Primitive Culture*, vol II, p. 13.

বলা বাহুল্য, ইহা সব খোস গল্প মাত্র।

যে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মস্মৃতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল না। কেন না, দুইটি সন্দেহের কারণ বিদ্যমান থাকে, (১) তিনি সত্য কথা বলিতেছেন কি না, (২) যদিও ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা না বলুন, তাঁহার সেই বিস্মৃতি কোন পীড়াজনিত মস্তিষ্কের বিক্রিয়া মাত্র কি না?

৫। যোগীদিগের পূর্ব্বজন্মস্মৃতিতে বিশ্বাসবান্ না হইলেও, আর এক প্রকার পূর্ব্বজন্মস্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে আসিলে মনে হয় যে, পূর্ব্বে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি—কোন একটা নূতন ঘটনা হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পূর্ব্বে কখন ঘটিয়াছিল। অথচ ইহাও নিশ্চিত স্মরণ হয় যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই। অনেকে এমন স্থলে বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটনা ঘটিয়াছিল—নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথা হইতে উদয় হয়?

এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য। অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি সত্য। অনেক পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাঁহাদের মনে কখন না কখন এমন স্মৃতির উদয় হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রও ইহার সত্যতা স্বীকার করে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, এ সকল "Fallacies of Memory" অথবা মস্তিষ্কের Double action. কিরূপে এরূপ স্মৃতির উদয় হয়, তাহা কার্পেণ্টর সাহেবের *Mental Physiology* নামক গ্রন্থ হইতে দুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইব।

"Several years ago the Rev. S. Hansard, now Rector of Bethnal Green, was doing clerical duty for a time at Hurstmonceaux in Sussex and while there, he one day went over with a party of friends to Pevensey Castle, which he did not remember to have previously visited. As he approached the gateway he became conscious of a very vivid impression of having seen it before and he "seemed to himself to see" not only the gateway itself but donkeys beneath the arch and people on the top of it. His conviction that he *must* have visited the castle on some former occasion—although he had neither the slightest remembrance of such a visit, nor any knowledge of having ever been in the neighbourhood previously to his residence at Hurstmonceaux—made him enquire from his mother if she could throw any light on the matter. She at once informed him that being in that part of the country when he was about *eighteen months* old, she had gone over with a large party and had taken him in the pannier of a donkey, that the elders of the party having brought lunch with them, had eaten it on the roof of the gateway, where they would have been seen from below, whilst he had been left with the attendants and donkeys.—This case is remarkable for the

vividness of the sensorial impression (it may be worth mentioning that Mr. Hansard has a decidedly artistic temperament) and for the reproduction of details which were not likely to have been brought up in conversation, even if he had happened to hear the visit itself mentioned as an event of his childhood, and of such mention he has no remembrance whatever."

যদি এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে আসিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না। পূর্ব্বজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ব্বজন্মস্মৃতি বলিয়া ধরিতেন সন্দেহ নাই। এইরূপ অনেক স্মৃতি আছে, যাহার আমরা কোন কারণ দেখি না, অনুসন্ধান করিলে ইহজন্মেই তাহার কারণ পাওয়া যায়। এইরূপ সকল অনুসন্ধানের আর একটি উদাহরণ কার্পেণ্টর সাহেবের ঐ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a Roman Catholic town in Germany a young woman who could neither read nor write, was seized with a fever and was said by the priests to be possessed of a devil, because she was heard talking Latin, Greek and Hebrew. Whole sheets of her ravings were written out and found to consist of sentences intelligible in themselves, but having slight connection with each other. Of her Hebrew sayings only a few could be traced to the Bible and most seemed to be in Rabbinical dialect. All trick was out of the question; the woman was a simple creature; there was no doubt as to the fever. It was long before any explanation, save that of demoniacal possession, could be obtained. At last the mystery was unveiled by a physician who determined to trace back the girl's history and who after much trouble discovered that at the age of nine she had been charitably taken by an old Protestant pastor, a great Hebrew scholar, in whose house she lived till his death. On further inquiry it appeared to have been the old man's custom for years to walk up and down a passage in his house into which the kitchen opened, and to read to himself with a loud voice out of his books. The books were ransacked and among them were found several of the Greek and Latin Fathers together with a collection of Rabbinical writings. In these works so many of the passages taken down at the young woman's bedside were indentified that there could be no reasonable doubt as to their source."

এ দেশে হইলে ইহার আর কোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, লাটিন ও হিব্রু এই স্ত্রীলোকের "পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার" মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত।

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না যে, এরূপ সকল স্মৃতিই, অনুসন্ধান করিলে, এই বর্ত্তমান জীবনমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বেশী অনুসন্ধান না হইলে এ কথা স্থির করিয়া বলা যায় না। তেমন বেশী অনুসন্ধান আজিও হয় নাই। যত দিন না হয়, তত দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ্য, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

অনুসন্ধানের ফল যাহা হউক, আর একটা তর্ক উঠিতে পারে। স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, না আত্মার ক্রিয়া? যদি বল, আত্মার ক্রিয়া, তবে পূর্ব্বজন্মের সবিশেষ স্মৃতি আমাদের মনে উদয় হয় না কেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতি কখন কদাচিৎ মনে আসার কথা বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মৃতি কোথায় গেল? আর যদি বল, স্মৃতি মস্তিষ্কের ক্রিয়া, তবে এই এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মৃতিই বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে? কেন না, যে মস্তিষ্কে পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, সে মস্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধ্বংস পাইয়াছে—আর নাই।

এ আপত্তির সুমীমাংসা করা যায়। কিন্তু প্রয়োজন নাই। কেন না, এই সকল স্মৃতি যে পূর্ব্বজন্মস্মৃতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না।

শেষ কথা এই যে, যাঁহারা জীবাত্মার নিত্যতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের জন্মান্তর স্বীকার ভিন্ন গতি নাই। আত্মা যদি নিত্য হয়, তবে অবশ্য পূর্ব্বে ছিল। কোথায় ছিল? পরমাত্মায় লীন ছিল, এ কথা বলা যায় না। কেন না, পরমাত্মায় যাহা লীন, তাহা জীবাত্মা নহে, তাহার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। আর যদি বল, লোকান্তরে ছিল, তাহা হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বলিতেই হইবে। লোকান্তরে ছিল, যদি এমন না বল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই দেহান্তরে ছিল।

এমন কেহ থাকিতে পারেন যে, আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করিবেন, কিন্তু নিত্যতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাৎ বলিবেন যে, দেহের সহিত আত্মার জন্ম হয়, জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্তু জন্মের পূর্ব্বে যে আত্মা ছিল, এমন না হইতে পারে। যাঁহারা এমন বলেন, তাঁহারা প্রত্যেক জীবজন্মে একটি নূতন সৃষ্টির কল্পনা করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ। কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মূলসূত্র এই যে, জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য্যয় ঘটে না। এখন জাগতিক নিয়মের মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি নাই। জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না,—নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তুর রূপান্তর হয় মাত্র।* এই যে জীব-শরীর, ইহা জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে কোন নূতন সৃষ্টি হইল, এমন কথা বলা যায় না; পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান জড়পদার্থ সমূহের নূতন সমবায় হইল মাত্র। অন্য বস্তুর রূপান্তর হইল মাত্র। আত্মা যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। কেন না, আত্মা জড়পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিকার নহে। পূর্ব্বজাত আত্মা সকলও অবিনাশী,

* নাবস্তুনো বস্তু-সিদ্ধিঃ *Ex nihilo nihil fit.*

সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে। কাজেই নূতন সৃষ্টি বলিতে হইবে। কিন্তু নূতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়মবিরুদ্ধ। অতএব আত্মাকে অবিনাশী বলিলে নিত্য ও অনাদি কাজেই বলিতে হয়। নিত্য ও অনাদি বলিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়।

আর যাঁহারা আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, তাঁহারা অবশ্য জন্মান্তরও স্বীকার করিবেন না। তাঁহাদিগের প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ অপ্রামাণ্য হইলেও ইহা তাঁহাদিগের কাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাঁহাদিগেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কি বলেন, শুনা যাউক।*

বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা Rhys Davids লেখেন,

"The doctrine of Transmigration in either the Brahmanical or the Budhist form, is not capable of disproof; while it affords an explanation, quite complete to those who can believe in it, of the apparent anomalies and wrongs in the distribution of happiness or woe.† The explanation can always be exact, for it is scarcely more than a repetition of the facts to be explained; it may always fit the facts, for it is derived from them; and it cannot be disproved,‡ for it lies in a sphere beyond the reach of human enquiry."

টৈলর সাহেব লিখিতেছেন—

"The Budhist Theory of "Karma," or "Action," which controls the destiny of all sentient beings, not by judicial rewards and punishment, but by the inexhorable result of cause into effect, where the present is ever determined by the past in an unbroken line of causation is indeed one of the world's most remarkable developments of ethical speculation." *Primitive Culture*, vol II, p. 12.

কথাটার ভিতর একটু নিগূঢ়ার্থ আছে। খ্রীষ্টানেরা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, স্বর্গে বসিয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিহিত করেন। টৈলর সাহেবের এ কথাটার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর যে হাকিমের মত বেঞ্চে বসিয়া ডিক্রী ডিসমিস করেন, তাহার অপেক্ষা এই কার্য্যকারণ সম্বন্ধে নিবদ্ধ

---

* অনেকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় লেখক জন্মান্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেন। Herder ও Lessing তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তদ্ভিন্ন Fourier, Soame Jenyns, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে।

† *Buddhism*, p. 100.

‡ যদি বল, প্রেততত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহভ্রষ্ট মনুষ্যাত্মা কখন কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া থাকে, তাহাতেও জন্মান্তরবাদের নিরাস হয় না। জন্মান্তরবাদীরা এমন বলেন না যে, সকল সময়েই মৃত্যু হইবামাত্র আত্মা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন দেহান্তরপ্রাপণ পক্ষে কালবিলম্ব ঘটে, তাহা হইলে জন্মান্তর অপ্রমাণিত হইল না।

জীবাদৃষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল করিয়া বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগুলি জাগতিক নিয়ম আছে। তাহা নিত্য, কখন বিপর্য্যস্ত হয় না। সেইগুলির প্রভাবে সমস্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়; জগদীশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে কোন কাজ করিতে হয় না। ইহাও সত্য, সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিন্তু সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া। কিন্তু যদি বলি যে, তিনি বিচারকার্য্যে ব্রতী হইয়া জীবের মৃত্যুর পর, তাহার অদৃষ্ট সম্বন্ধে ডিক্রী ডিসমিস করিয়া কাহাকে স্বর্গে বা কাহাকে নরকে পাঠাইতেছেন, তবে যাহা জগতের বিরুদ্ধ, তাহা কল্পনা করা হইল। এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে না, স্বয়ং জগদীশ্বরকে কার্য্য করিতে হইতেছে। প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার বিধান, এক একটি ঈশ্বরের অনিয়মসিদ্ধ কার্য্য—অর্থাৎ miracle. কিন্তু জন্মান্তরবাদে এ আপত্তি ঘটে না। ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত হইবে। কর্ম্ম কারণ, যোনিবিশেষ তাহার কার্য্য। এইরূপ কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-নিবদ্ধ কর্ম্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়—"miracle" প্রয়োজন হয় না।

শ্লেগেল বড় গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান, কিন্তু তিনি ইউরোপের এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও পণ্ডিত। তিনি এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি।

"In this doctrine, there was a noble element of truth—the feeling that man, since he has gone astray, and wandered so far from his God, must needs exert many efforts, and undergo a long and painful pilgrimage before he can regain the source of all perfection ;—the firm conviction and positive certainty that nothing defective, impure, or defiled with earthly stains can enter the pure region of perfect spirits, or be eternally united to God ; and that thus before it can attain to this blissful end, the immortal soul must pass through long trials and many purifications. It may now well be conceived, (and indeed the experience of this life would prove it) that suffering, which deeply pierces the soul, anguish that convulses all the members of existence, may contribute, or may even be necessary, to the deliverance of the soul from all alloy, and pollution, or to borrow a comparison from natural objects, the generous metal is melted down in fire and purged from its dross. It is certainly true that the greater the degeneracy and the degradation of man, the nearer is his approximation to the brute ; and when the transmigration of the immortal soul through the bodies of various animals is merely considered as the punishment of its former transgressions, we can very well understand the opinion which supposes that man who by his crimes and the abuse of his reason, had descended to the level of the brute should at last be transformed into the brute itself." *

* Philosophy of History—translatad by Robertson—Bohn's Edition, pp. 157-8.

পরিশেষে আমেরিকা-নিবাসী সামুয়েল জনসন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ইঁহার মত বিজ্ঞ লেখক দুর্লভ।

"The Transmigration faith was so widely spread in the elder world, because it had its roots in natural and profound aspirations. It combined the two-fold intuition of immortality and moral sequence with that mystic sense of the unity of being which is a germ of the highest religious truth." *

এক্ষণে যাহা বলা হইল, তাহার স্থূল মর্ম্ম বলিতেছি।

১। জন্মান্তরবাদ অপ্রমাণ করা যায় না।

২। ইহার পক্ষে কোন রকম কিছু প্রমাণও আছে।

৩। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন, তাঁহাদিগের নিকট ইহার প্রামাণ্যতা অখণ্ডনীয়।

৪। যাঁহারা আত্মার অবিনাশিতা স্বীকার করেন না, এই তত্ত্ব তাঁহাদিগের নিকটও অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না, কেন না, জাগতিক নিত্য নিয়মাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিযুক্ত পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচলিত নাই।

যিনি ভক্ত, তাঁহার পক্ষে এ সকল বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। যদি এই শ্লোকটিতে ঈশ্বরোক্তির মর্ম্ম থাকে, তবে তাহাই তাঁহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ। তাঁহার বিচার্য্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্তি, না গ্রন্থকারের বিশ্বাসমাত্র—তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাক্যমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন?

যদি কাহারও এমন সংশয় উপস্থিত হয় যে, ইহা ভগবদুক্তি কি না এবং উপরে যে সকল প্রমাণের উপরে সমালোচনা করা গেল, তাহাতে যদি জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্ না হয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞাসা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না করিলেও, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করা যায় কি না?

ইহার উত্তর বড় সোজা। এই গীতোক্ত ধর্ম্ম সমস্ত মনুষ্যের জন্য। জন্মান্তরে যে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ভক্তি না করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সংযম অনীশ্বরবাদীর পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম; সেই চিত্তশুদ্ধি এই গীতার উদ্দেশ্য। এরূপ বিশ্বলৌকিক ও সর্ব্বব্যাপক

* Oriental Religions : India, p. 539.

ধর্ম্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই। যাঁহার যতটুকুতে অধিকার, তিনি ততটুকু গ্রহণ করিবেন। যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারী। যাঁহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা ইহাতে পাইবেন।

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪ ॥

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখজনক। সে সকলের উৎপত্তি ও অপায় আছে, অতএব তাহা অনিত্য, অতএব হে ভারত! সে সকল সহ্য কর। ১৪।

একাদশ শ্লোকে বলা হইল যে, যাহার জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহার জন্য তুমি শোক করিতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল। সে কারণ এই যে, কেহই ত মরিবে না, কেন না, আত্মা অবিনাশী। তুমি কাটিয়া পড়িলেও সে থাকিবে, কেন না, তাহার আত্মা থাকিবে। একাদশ শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জন্মান্তর জনসমাজে গৃহীত। একাদশ শ্লোকে অর্জ্জুনের আপত্তি আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ তাহারই খণ্ডন করিতেছেন। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, আত্মা না হয় রহিল, কিন্তু যখন দেহ গেল, তখন আমার আত্মীয় ব্যক্তি যাহার জন্য শোক করিতেছি, সে আর রহিল কৈ? দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যক্তি হইল। এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এরূপ ভেদ কল্পনা করা অনুচিত, কেন না, যেমন কৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিরই অবস্থান্তর মাত্র, তেমনি দেহান্তর-প্রাপ্তিও অবস্থান্তর মাত্র। ইহাতেও অর্জ্জুন আপত্তি করিতে পারেন যে, না হয় স্বীকার করা গেল যে, দেহান্তরেও দেহীর একতা থাকে—কিন্তু মৃত্যুর একটা দুঃখ-কষ্ট ত আছেই? এই স্বজনগণ সেই কষ্ট পাইবে—তাহা স্মরণ করিয়া শোক করিব না কেন? তাহাদের বিরহে কাতর হইব না কেন?

তাহার উত্তরে ভগবান্ এই চতুর্দ্দশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই দুঃখ বলিতেছ, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ-জনিত। যতক্ষণ সেই সংযোগ থাকে, ততক্ষণ সেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন যতক্ষণ ত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদি উত্তাপের বা হিমের শৈত্যের সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা শীত স্বরূপ যে দুঃখ, তাহা অনুভূত করি, রৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না।

* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ।

যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহ্য করিলেই ফুরাইবে, তাহার জন্য কষ্ট বিবেচনা করিব কেন?

এই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্য গুণ থাকিলেই জীবন মধুর হয়। অভ্যাস করিলে অভ্যাস-গুণে আর কোন দুঃখকেই দুঃখবোধ হয় না। তার পর এই গীতোক্ত সর্ব্বানন্দময়ী ভক্তিতে মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আপ্লুত হয়। দুঃখমাত্র থাকে না। জীবনকে সুখময় করিবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিষ্ণুতা আছে—তাহা ব্যতীত কিছু হইবে না। ইন্দ্রিয়গণের সহিত বহির্ব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ—ভোগবিলাসাদি, তাহাও দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে, কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয়। এই জন্য "শীতোষ্ণ সুখদুঃখ" একত্র গণনা করা হইয়াছে।*

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

হে পুরুষর্ষভ! সুখদুঃখে সমভাব যে ধীর পুরুষ এ সকলে ব্যথিত হন না, তিনিই মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫।

সুখ দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মুক্তিই, মুক্তি বা মোক্ষ। সংসার দুঃখময়। যাঁহারা বলেন, সংসারে দুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশী, তাঁহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে। এজন্য জন্মান্তরও দুঃখ, কেন না, পুনর্ব্বার সংসারে আসিয়া আবার দুঃখভোগ করিতে হইবে। অতএব পুনর্জ্জন্ম হইতে মুক্তিলাভও মুক্তি বা মোক্ষ। স্থূলতঃ দুঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য সাংখ্যকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, "ত্রিবিধদুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থ।" এখন, দুঃখ সহ্য করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল। কেন না, যে দুঃখ সহ্য করিতে

---

* এথানে মূলে যে মাত্রা শব্দ আছে, ও মাত্রাস্পর্শ পদ আছে; তাহার দুই প্রকার অর্থ করা যায়। উহার দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং ইন্দ্রিয়গণের বিষয়কেও বুঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্য্য বলেন, "মাত্রা আভির্ম্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ।" শ্রীধরস্বামীও ঐরূপ বলেন, যথা—"মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাঃ (মাত্রাস্পর্শাঃ)।" মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক তাই বলেন। পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, "মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াঃ।" তাতেও বড় আসিয়া যাইত না, কিন্তু একজন ইংরেজ অনুবাদক Davis স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব্দ লাটিন ভাষায় Materia ও ইংরাজিতে matter, সুতরাং তিনি "মাত্রাস্পর্শাঃ" পদের অনুবাদে "Matter-contacts" লিখিয়াছেন। পরিমাণজ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়বিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদর্শনের "তন্মাত্র" শব্দের তাৎপর্য্য বিচার করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আমি বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও ডেভিস সাহেবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধরস্বামীর অনুসরণ করিয়াছি।

শিখিয়াছে, সে দুঃখকে আর দুঃখ মনে করে না। তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়া তাহার মোক্ষলাভ হইয়াছে। অতএব মোক্ষের জন্য মরিবার প্রয়োজন নাই। দুঃখ সহ্য করিতে পারিলে, অর্থাৎ দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহজীবনেই মোক্ষলাভ হইল।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অসৎ বস্তুর অস্তিত্ব নাই, সদ্বস্তুর অভাব হয় না। তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ উভয়ের অন্তদর্শন করিয়াছেন। ১৬।

অস্ ধাতু হইতে সৎ শব্দ হইয়াছে। যাহা থাকিবে, তাহাই সৎ; যাহা নাই বা থাকিবে না, তাহাই অসৎ। আত্মাই সৎ; শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখ অসৎ। নিত্য আত্মায় এই অনিত্য শীতোষ্ণাদি সুখ দুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সৎ যে আত্মা, অসৎ শীতোষ্ণাদি তাহার ধর্ম্মবিরোধী। শ্রীধরস্বামী এইরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাৎ অবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ন ভাবঃ।" আমরা তাঁহারই অনুসরণ করিয়াছি।

শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোক অবলম্বন করিয়া সদসদ্‌বুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্ব্বক আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল বিষয় কোন্ দিক্ হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্ দিক্ হইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন। এই শ্লোকের শঙ্করপ্রণীত ভাষ্য অতিশয় দুরূহ। নিম্নে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল।

"কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসৎস্বরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি কার্য্যের অস্তিত্ব নাই। শীত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়; সুতরাং উহারা সৎ পদার্থ হইতে পারে না। কারণ, উহারা বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্ব্বদা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় (অর্থাৎ কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেও ঘটাদি পদার্থ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছু* বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া উপলব্ধি না হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার বিকার পদার্থ ই অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং ধ্বংসের পরে, মৃত্তিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাদি কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও

* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্তিকার জ্ঞান জন্মায়। মৃত্তিকার জ্ঞান না জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না, সুতরাং ঘট অসৎ, উহার কারণ মৃত্তিকা সৎ।

অসৎ। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, কারণসমূহ এইরূপে অসৎ হইলে সকল পদার্থই অসৎ হইয়া পড়ে, (সৎ আর কিছুই থাকে না।) এরূপ আপত্তির খণ্ডন এই যে, সকল স্থলেই দুই প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়; সৎ বলিয়া জ্ঞান ও অসৎ বলিয়া জ্ঞান। যে বস্তুর জ্ঞানের ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে বস্তু একবার "আছে" বলিয়া বোধ হইলে আর "নাই" বলিয়া বোধ হয় না, তাহার নাম সৎ। আর যে বস্তু একবার আছে বলিয়া বোধ হইলে পরে আবার নাই বলিয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসৎ। এইরূপে বুদ্ধিতন্ত্র সৎ ও অসৎ দুই ভাগে বিভক্ত, এবং সকলেই সর্ব্বত্র, এই দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়া উপলব্ধি করেন। বিশেষণ ও বিশেষ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন "নীলং উৎপলং" ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ঐ উৎপলের জ্ঞান হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীলত্বেরও জ্ঞান হইবে। এইরূপ যখন "ঘটঃ সন্" "পটঃ সন্" "হস্তী সন্" ইত্যাদি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সহিত "সৎ" এই জ্ঞান অভিন্নভাবে উৎপন্ন হয়। সুতরাং সৎ ও অসৎ ভেদবুদ্ধির যে কল্পনা করা হইতেছিল, তাহা নিরর্থক হয়। কিন্তু লোকে এরূপ অভিন্নভাবে উপলব্ধি করে না। এই বুদ্ধিদ্বয়ের (সৎ ও অসৎ) মধ্যে ঘটাদি বুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে; সৎ বুদ্ধির ব্যভিচার হয় না। অতএব ব্যভিচার হয় বলিয়া যে পদার্থ ঘটাদি বুদ্ধির বিষয় তাহা অসৎ, এবং অব্যভিচার হয় না বলিয়া উহা সৎ বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না।

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সৎ-বুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক (অর্থাৎ আপত্তিকারীর মতে ঘটবুদ্ধি ও সৎবুদ্ধি অভিন্ন, সুতরাং ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার হইলে সৎবুদ্ধিরও ব্যভিচার হউক)। এই আপত্তি খাটিতে পারে না, কারণ তৎকালে সেই সৎবুদ্ধি ঘটাদিতে বর্ত্তমান থাকে, (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় না।) সে সৎবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবস্থিত, সুতরাং (বিশেষ্যনাশে) বিনষ্ট হয় না।

যদি বল, সৎবুদ্ধি স্থলে যেরূপ যুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে ত ঘটবুদ্ধি থাকে, "সুতরাং ঘটবুদ্ধি সৎ হউক," এ আপত্তি ইহাতে খাটিতে পারে না; যেহেতু সে ঘটবুদ্ধি পটাদিতে থাকে না।

যদি বল, সৎবুদ্ধিও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সৎবুদ্ধি *বিশেষণভাবে অবস্থিত, বিশেষ্যের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না। থাকিলে তাহার বিষয় কি হইবে?* বিষয়ের অভাব হইলে সৎবুদ্ধি থাকে না। *যদি বল, ঘটাদি* বিশেষ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় বলিয়া

ঘট সৎ হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরীচিকা প্রভৃতি স্থলেও সৎবুদ্ধি এবং উদক উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভক্তিতে 'সৎ ইদং উদকং' এরূপ ব্যবহার হয়, (ইহা দ্বারা এক বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া সৎ অথবা অসৎ এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে।)

অতএব দেহাদি দ্বন্দ্ব কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসৎ, উহার অস্তিত্ব নাই ; এবং সৎ যে আত্মা, তাঁহারও কোথাও অভাব নাই, যেহেতু তাঁহার কোথাও ব্যভিচার হয় না। ইহাই সৎ এবং অসৎরূপ আত্মা এবং অনাত্মার স্বরূপনির্ণয়। যে সৎ সে সৎই, যে অসৎ সে অসৎই।*

শঙ্করাচার্য্য যেমন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত, এই দার্শনিক বিচারও তাহার উপযুক্ত। তবে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ দুঃখকে সৎই বল, আর অসৎই বল, সুখ দুঃখ আছে। থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বলিবার বিষয় নাই। কিন্তু থাকিবে না, এইটাই বড় কাজের কথা। তবে, সহ্য করিতে পারিলেই দুঃখ নষ্ট হইবে।

"——The darkest day,
Wait till to-morrow,
Will have passed away."

এখন, ১৪।১৫।১৬, এই তিন শ্লোকে যাহা উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে, কয়েকটি আপত্তি উপস্থাপিত হইতে পারে। প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ্য করিতে হইবে—নিবারণ করিতে হইবে না? অর্জ্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ ; যুদ্ধ না করিলেই সে দুঃখ নিবারণ হইল ; দুঃখনিবারণের সহজ উপায় আছে। এ স্থলে তাঁহাকে দুঃখনিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া ভগবান্ দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা কিরূপ উপদেশ? রোগীর রোগের উপশমের জন্য ঔষধ ব্যবহার করিতে পরামর্শ না দিয়া তাহাকে রোগের দুঃখ সহ্য করিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে কি এ উপদেশ তুল্য নহে?

না। তাহা নহে। দুঃখ নিবারণের কোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ নিবারণ করিতে গেলে অধর্ম্ম হয়, সেখানে দুঃখ নিবারণ না করিয়া সহ্য করিবে। যে যুদ্ধে অর্জ্জুন প্রবৃত্ত, তাহা ধর্ম্মযুদ্ধ। ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের আর ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্ম পরিত্যাগে অধর্ম্ম। অতএব এ স্থলে দুঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধর্ম্ম আছে। এজন্য এখানে সহ্য করিতে হইবে, নিবারণ করা হইবে না।

* শাঙ্কর ভাষ্যের এই অনুবাদ আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, দুঃখই সহ্য করিবে—সুখ সহ্য করা কিরূপ? সুখ দুঃখ সমান জ্ঞান করিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর কোন সুখে সুখ হইবে না? তবে আর aceticism কাহাকে বলে? সুখশূন্য ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে?

ইহার উত্তর পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের কারণ—তাহা দুঃখমধ্যে গণ্য। ইন্দ্রিয়াদির অনধীন যে সুখ, যথা—জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি, দয়াদিজনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্ম্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্ম্মের সেই সুখই উদ্দেশ্য। আর ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃত পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে। তৎ-পরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক্ত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, পরিত্যাগ উদ্দেশ্য নহে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ২। ৬৪ ॥

উক্ত চতুঃষষ্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমরা এ বিষয়ে আরও কিছু বলিব।

আমরা দেখিতেছি যে, দ্বাদশ শ্লোকে হিন্দুধর্ম্মের প্রথম তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে, আত্মার অবিনাশিতা। ত্রয়োদশ শ্লোকে দ্বিতীয় তত্ত্ব—জন্মান্তরবাদ। এই চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, এবং ষোড়শ শ্লোকে তৃতীয় তত্ত্ব সূচিত হইতেছে—সুখদুঃখের অনাত্মধর্ম্মিতা ও অনিত্যত্ব। সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যার উপলক্ষে, আত্মার সঙ্গে সুখদুঃখের সম্বন্ধ পূর্ব্বে যেরূপ বুঝাইয়াছিলাম, তাহা বুঝাইতেছি।

"শরীরাদি ব্যতিরিক্ত পুরুষ। কিন্তু দুঃখ ত শারীরাদিক; শারীরাদিতে যে দুঃখের কারণ নাই,—এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি—বাহ্য পদার্থই তাহার মূল। আমার বাক্যে তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকৃতিক পদার্থ, তাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ করিলে, তাহাতে তোমার দুঃখ। অতএব প্রকৃতি ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্তু প্রকৃতিঘটিত দুঃখ পুরুষে বর্ত্তে কেন? "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ।" পুরুষ একা, কাহারও সংসর্গবিশিষ্ট নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সূত্র।) অবস্থাদি, সকল শরীরের, আত্মার নহে। (ঐ ১৪ সূত্র।) "ন বাহ্যান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোঽপি দেশব্যবধানাৎ স্রুঘ্নস্থপাটলিপুত্রস্থয়োরিব।" বাহ্য এবং আন্তরিকের মধ্যে উপরজ্য এবং উপরঞ্জক ভাব নাই; কেন না, তাহা পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানবিশিষ্ট, যেমন এক জন পাটলিপুত্র নগরে থাকে, আর একজন স্রুঘ্ন নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের ব্যবধান। তদ্রূপ।

তবে পুরুষের দুঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই দুঃখের কারণ। বাহ্যে আন্তরিকে দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্তু কোন প্রকার সংযোগ নাই, এমত নহে। যেমন স্ফাটিক পাত্রের নিকট জবা কুসুম রাখিলে পাত্র পুষ্পের বর্ণবিশিষ্ট হয় বলিয়া, পুষ্প এবং পাত্রে এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ। পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ। এ সংযোগ নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনীত হইল। অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্তিই দুঃখনিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থস্তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ (৬, ৭।)*

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

যাঁহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাঁহাকে অবিনাশী জানিবে। এই অব্যয়ের কেহই বিনাশ করিতে পারে না। ১৭।

"যাহার দ্বারা" অর্থাৎ পরমাত্মার দ্বারা। এই "সকলই" অর্থাৎ জগৎ। এই সমস্ত জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত—শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আকাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ ব্যাপ্ত।

যাহা সর্ব্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন না, যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে। যত কাল কিছু থাকিবে, তত কাল সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তা সর্ব্বব্যাপীই থাকিবে। অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্ব্বব্যাপী, আকাশের বিনাশ বা ক্ষয় আমরা মনেও কল্পনা করিতে পারি না। আকাশ অবিনাশী এবং অব্যয়। যিনি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং আকাশও যাঁহার দ্বারা ব্যাপ্ত, তিনিও অবিনাশী ও অব্যয়। কাজেই কেহই ইঁহার বিনাশসাধন করিতে পারে না।

এক্ষণে, এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথা সূচিত হইতেছে। সেই সকল কথা হিন্দুধর্ম্মের স্থূল কথা, এজন্য এখানে তাহার উত্থাপন করা উচিত।

প্রথমতঃ, এই শ্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে পারেন না। যাহা সাকার, তাহা সর্ব্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য। আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ্য সাকার সর্ব্বব্যাপী কোন পদার্থ নাই। অতএব ঈশ্বর যদি সর্ব্বব্যাপী হয়েন, তবে তিনি সাকার নহেন।

* প্রবন্ধ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত।

ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশাস্ত্রের এবং হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষৎ এবং দর্শনশাস্ত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য কল্পিত হইয়া অনেক স্থলে ঈশ্বরস্বরূপ উপাসিত হইয়াছেন। যে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই। কেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণেতিহাসে শিবাদি সাকার বলিয়া কথিত হইলেও, পুরাণ ও ইতিহাসকারেরা ঈশ্বরের সাকারতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাকার, তাহা কখনই ভুলেন না। পুরাণেতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার।

একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিষ্ণুপুরাণের প্রহ্লাদচরিত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। তথায় বিষ্ণুই ঈশ্বর। প্রহ্লাদ তাঁহাকে "নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ" বলিয়া স্তব করিতেছেন। অন্য স্থলে স্পষ্টতঃ সাকারতা স্বীকার করিতেছেন। যথা—

ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তুভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

এবং পরিশেষে পীতাম্বর হরি সশরীরে প্রহ্লাদকে দর্শন দিলেন। কিন্তু তথাপি, এই প্রহ্লাদচরিত্রে বিষ্ণু নিরাকার; তাঁহার নাম "অনন্ত", তিনি "সর্ব্বব্যাপী"। যিনি অনন্ত এবং সর্ব্বব্যাপী, তিনি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি যে নির্গুণ ও নিরাকার, তাহা পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ পরাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে। ইত্যাদি। ১।১৯।৭৯

পুনশ্চ, বিষ্ণু "অনাদিমধ্যান্তঃ" সুতরাং নিরাকার।

এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে। অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই যে হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত।

তবে কি হিন্দুধর্ম্মে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রামে গ্রামে ত প্রত্যহ প্রতিমা-পূজা দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রতিমার্চ্চনায় পরিপূর্ণ। তবে হিন্দুধর্ম্মে সাকারবাদ নাই কি প্রকারে বলিব?

ইহার উত্তর এই যে, অন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রতিমার্চ্চনা সাকারের উপাসনা নয়; এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চ্চনা করে, সে নিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে করে

না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা ঈশ্বরের প্রকৃত প্রতিমা। যে একখানা মাটির কালী গড়িয়া পূজা করে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার কিছুমাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্রিত মৃৎপিণ্ড ঈশ্বর নহে বা ঈশ্বরের প্রতিমা নহে, এবং সে জানে, তাহা ঈশ্বরের প্রতিকৃতি হইতে পারে না।

তবে সে এ মাটির তালের পূজা করে কেন? সে যাঁহার পূজা করিবে, তাঁহাকে খুঁজিয়া পায় না। তিনি অদৃশ্য, অচিন্তনীয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার অতীত। কাজেই সে তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, "হে বিশ্বব্যাপিনি সর্ব্বময়ি আদ্যাশক্তি! তুমি সর্ব্বত্রই আছ, কিন্তু আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্ব্বত্রই আবির্ভূত হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবির্ভূত হও। আমি তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গড়িয়াছি, তাহাতে আবির্ভূত হও, আমি তোমার উপাসনা করি। নহিলে কোথায় পুষ্পচন্দন দিব, তদ্বিষয়ে মনঃস্থির করিতে পারি না।

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং তাঁহাদিগের শিষ্য নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ। ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ, বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে। শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়ের রাগ, কেন না, ইংরেজের ইহার উপর রাগ। যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা "আমাদের" অবশ্য নিন্দনীয়। প্রতিমাপূজা ইংরেজের নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপূজা অবশ্য "আমাদের" নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে যে, এই প্রতিমাপূজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসন্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে উৎসন্ন যাইবে; সুতরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই। সত্য বটে রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রতিমাপূজা করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে, অতএব ভারতবর্ষ নিশ্চয় প্রতিমাপূজায় উৎসন্ন যাইবে; তদ্বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই! এইরূপ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন। অন্যমত বিবেচনা করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন।

আমরা এরূপ উক্তির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সকলের অন্তর্যামী। সকলের অন্তরের ভিতর তিনি প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের উপাসনা গ্রহণ করিতে পারেন, কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি অচিন্তনীয়। অতএব তাঁহার চক্ষে

সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য; কেহই তাঁহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যদি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং ভক্তিশূন্য উপাসনা যদি তাঁহার অগ্রাহ্যই হয়, তবে ভক্তিযুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিবে না। অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষীয়ের যদি ঈশ্বরে ভক্তি থাকে, তবে সাকার উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও কেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসনায়ও উৎসন্ন হইবে, তদ্বিষয়ের কোন সংশয় নাই। সাকার ও নিরাকার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিষ্ফল নহে; এবং এতদুভয়ের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ নাই। সুতরাং উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার নিষ্প্রয়োজনীয়।

সাকারোপাসকেরা বলিয়া থাকেন, নিরাকারের উপাসনা হয় না। অনন্তকে আমরা মনে ধরিতে পারি না, সুতরাং তাঁহার ধ্যান বা চিন্তা আমাদের দ্বারা সম্ভব নহে, এ কথারও বিচার নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়। কেন না, এমন যদি কেহ থাকেন যে, তিনি আপনার সান্তচিন্তাশক্তির দ্বারা অনন্তের ধ্যান বা চিন্তায় সক্ষম, এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তবে তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। অতএব সাকারোপাসক ও নিরাকারোপাসকের মধ্যে বিচার, বিবাদ ও পরস্পরের বিদ্বেষের কোন কারণ দেখা যায় না।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, আমি "সাকারের উপাসনা," এবং "সাকারোপাসক" ভিন্ন "সাকারবাদ" বা "সাকারবাদী" শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। কেন না, "সাকারবাদ" অবশ্য পরিহার্য্য। ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে।

কথাটা উঠিতে পারে যে, ঈশ্বর যদি সাকার নহেন, তবে হিন্দুধর্ম্মের অবতারবাদের কি হইবে? এই গীতার বক্তা কৃষ্ণকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক। ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু কৃষ্ণ সাকার। ইহাকে তবে কি প্রকারে ঈশ্বরাবতার বলা যাইবে? এই প্রশ্নের যথাসাধ্য উত্তর আমি কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে দিয়াছি, সুতরাং এখানে সে সকল কথা পুনর্ব্বার বলিবার প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সুতরাং ইচ্ছানুসারে তিনি যে আকার ধারণ করিতে পারেন না, এ কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়।

"যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইত্যাদি বাক্যে অনেকের এইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে যে, বিলাতী Pantheism এবং হিন্দুধর্ম্মের ঈশ্বরবাদ বুঝি একই। স্থানান্তরে এই ভ্রমের নিরাস করা যাইবে।

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮ ॥

নিত্য, অবিনাশী এবং অপ্রমেয় আত্মার এই দেহ নশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব হে ভারত! যুদ্ধ কর। ১৮।

নিত্য, অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপে স্থিত (শ্রীধর)।

অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য। প্রত্যক্ষাদির অতীত।

শ্রীধর এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—"নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, অতএব অবিনাশী, ও অপ্রমেয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন যে আত্মা, তাঁহার এই দেহ সুখদুঃখাদিধর্ম্মক, ইহা তত্ত্বদর্শীদিগের দ্বারা উক্ত; যখন আত্মার বিনাশ নাই, সুখদুঃখাদি সম্বন্ধ নাই, তখন মোহজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর, অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিও না।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যার পর শঙ্করাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলেন—"ইহাতে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিধান করা হইতেছে না। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও ইনি শোকমোহপ্রতিবদ্ধ হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে আছেন, ভগবান্‌ তাঁহার কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধের অপনয়ন করিতেছেন মাত্র। অতএব 'যুদ্ধ কর' ইহা অনুবাদ মাত্র, বিধি নয়।"

অনেকের বিশ্বাস যে, এই গীতাগ্রন্থের স্থূল উদ্দেশ্য—যুদ্ধের ন্যায় নৃশংস ব্যাপারে মনুষ্যের প্রবৃত্তি দেওয়া। তাঁহারা যে গীতা বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য। গীতা, বাজারের উপন্যাস-গ্রন্থ নহে যে, একবার পড়িবা মাত্র উহার সমস্ত তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। বিশেষরূপে উহার আলোচনা না করিলে বুঝা যায় না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—স্বধর্ম্মপালনের অপরিহার্য্যতা প্রতিপন্ন করা। স্বধর্ম্ম বলিলে শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝিতে কষ্ট পাইতে পারেন, ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—Duty— শুনিলে বোধ হয় সে কষ্ট থাকিবে না। গীতার এতদংশের উদ্দেশ্য—সেই Duty ধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা প্রতিপন্ন করা। সকল মনুষ্যের স্বধর্ম্ম এক প্রকার নহে—কাহারও স্বধর্ম্ম দণ্ড-প্রণয়ন ; কাহারও স্বধর্ম্ম ক্ষমা। শিপাহির স্বধর্ম্ম শত্রুকে আঘাত করা, ডাক্তারের স্বধর্ম্ম সেই আঘাতের চিকিৎসা। মনুষ্যের যত প্রকার কর্ম্ম আছে, তত প্রকার স্বধর্ম্ম আছে। কিন্তু সকল প্রকার স্বধর্ম্ম মধ্যে যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ব্যাপার। যুদ্ধ পরিহার করিতে পারিলে, যুদ্ধ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু এমন অবস্থা ঘটে যে, এই নৃশংস কার্য্য অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য হইয়া উঠে। তৈমুরলঙ্গ বা নাদের দেশ দগ্ধ ও লুণ্ঠিত করিতে আসিতেছে, এমন অবস্থায় যে যুদ্ধ করিতে

জানে, যুদ্ধ তাহারই অপরিহার্য্য ও অবশ্যসম্পাদ্য স্বধর্ম্ম। অতএব গীতাকার স্বধর্ম্মপালন সম্বন্ধে ইংরেজি দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে Crucial instance বলে, তাহাই অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্মের অবশ্যসম্পাদ্যতা এবং তদুপলক্ষে সমস্ত ধর্ম্মেরও নিগূঢ় রহস্য ব্যাখ্যাত করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ, যে স্বধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ ও যাহাতে সাধুজনমাত্রই স্বতঃ অপ্রবৃত্ত তাহাই গ্রহণ করা হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে—যুদ্ধের মধ্যে যে যুদ্ধ সর্ব্বাপেক্ষা নৃশংস ও ভয়াবহ, যাহাতে স্বভাবতঃ নৃশংস ব্যক্তিও সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না, তাহাই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। Crucial instance বটে। গীতার উদ্দেশ্য ইহাই প্রতিপাদন করা যে, স্বধর্ম্ম এরূপ নৃশংস, ভয়াবহ এবং সাধুজনপ্রবৃত্তির আপাত-বিরোধী হইলেও তাহা অবশ্যপালনীয়।

কিন্তু শ্লোকটার ভাবার্থ, বোধ করি, এখনও পরিষ্কার হয় নাই। 'আত্মা অবিনাশী—কেহ তাহার বিনাশ করিতে পারে না—অতএব যুদ্ধ কর,' এই কথার অর্থ কি? আত্মা অবিনাশী বলিয়া কাহাকে হত্যা করায় কি দোষ নাই? ভগবদ্বাক্যের সে তাৎপর্য্য নহে। ইহার তাৎপর্য্য উপরিধৃত শঙ্করভাষ্যে যাহা কথিত হইয়াছে, তাই। অর্জ্জুন যুদ্ধে প্রবৃত্ত, তবে মোহে অভিভূত হইয়া, মানুষ মারিতে হইবে, এই দুঃখে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন। ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, দুঃখ করিবার কারণ কিছুই নাই—কেন না, কেহই মরিবে না। শরীর নষ্ট হইবে বটে, কিন্তু শরীর ত অনিত্য, অর্জ্জুন যুদ্ধ না করিলেও এক দিন অবশ্য নষ্ট হইবে। কিন্তু শরীর নষ্ট হইলে মানুষ মরে না—যাহার শরীর, সে অমর—কেহই তাহাকে মারিতে পারে না। অতএব যুদ্ধের প্রতি অর্জ্জুন যে আপত্তি উপস্থিত করিতেছেন, সেটা ভ্রমজনিত মাত্র। অতএব তিনি যুদ্ধ করিতে পারেন।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯ ॥

যে ইঁহাকে হন্তা বলিয়া জানে, এবং যে ইঁহাকে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই অনভিজ্ঞ। ইনি হত্যা করেন না—হতও হয়েন না। ১৯।

প্রাচীন টীকাকারেরা, এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন; যথা—ভীষ্মাদির মৃত্যু-নিমিত্ত অর্জ্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল। এক্ষণে "আমি ইহাদের বধের কর্ত্তা" এই নিমিত্ত যে দুঃখ, প্রথম অধ্যায়ের ৩৪।৩৫ ইত্যাদি শ্লোকে অর্জ্জুনের দ্বারা উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগবান্ বুঝাইতেছেন যে, আত্মা যেমন কাহারও কর্ত্তৃক হত হয়েন না, তেমনি তিনি কাহাকেও হত্যা করেন না। কেন না, আত্মা অবিক্রিয়।

শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়েরা যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে সেইরূপ বলিতেছি। ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ করিব। অন্য অর্থ হয় কি না, তাহাও বলা যাইবে। টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, তাহার প্রমাণ পরবর্ত্তী শ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০ ॥

ইনি জন্মেন না বা মরেন না, কখন হয়েন নাই, বর্ত্তমান নাই বা হইবেন না। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ; শরীর হত হইলে ইনি হত হয়েন না। ২০।

টীকাকারেরা বলেন, আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহার ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বের দ্বারা দৃঢ়ীকৃত করা হইতেছে। ইনি জন্মশূন্য—এই কথার দ্বারা জন্ম প্রতিষিদ্ধ হইল; মরেন না—ইহাতে বিনাশ প্রতিষিদ্ধ হইল। ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্ত্তমান নাই। যাহা জন্মে, তাহাকেই বর্ত্তমান বলা যায়; কিন্তু ইনি পূর্ব্ব হইতে স্বতঃ সদ্রূপে আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া যে বিদ্যমানতা, তাহা ইঁহার নাই। এবং সেই জন্য ইনি আবার জন্মিবেন না। সেই জন্য ইনি অজ অর্থাৎ জন্মশূন্য, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদা একরূপ, শাশ্বত অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, পুরাণ অর্থাৎ বিপরিণামশূন্য।

এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি শ্লোকের প্রতি মনোভিনিবেশ করিলেই দেখিতে পাইবেন যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে কোন কথা স্পষ্টতঃ মূলে নাই। অস্পষ্টতঃ "নায়ং হন্তি" এই কথাটা আছে, কিন্তু ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে। যদি কেহ মরে না, তবে আত্মাও কাহাকে মারে না।

আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের একটি মত। তত্ত্বটা কি, তাহা পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত করা আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আবশ্যক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্তু এই দুইটি শ্লোক গীতার নহে। শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদের। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের যেটি ১৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদেরও দ্বিতীয় বল্লীর ১৯শ শ্লোক; আর গীতার ঐ অধ্যায়ের যেটি ২০শ শ্লোক, তাহাও কঠোপনিষদের ঐ বল্লীর ১৮শ শ্লোক। গীতার শ্লোক ও কঠোপনিষদের শ্লোক পাশাপাশি লেখা যাইতেছে।

গীতা।

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২। ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২। ২০

কঠোপনিষদ্।

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥ ২। ১৯
ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ম্পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২। ১৮

শ্লোক দুইটি কঠোপনিষদ্ হইতে গীতায় আনীত হইয়াছে, গীতা হইতে কঠোপনিষদে নীত হয় নাই। এ কথা লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই। আমরা দেখিব, উপনিষদ্ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনীত হইয়াছে। অন্ততঃ প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের এই মত। শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায়" এবং আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং ইত্যাদ্যামৃচমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি।"

এক্ষণে এই শ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রথম, আত্মা যদি কর্ত্তা নহে, তবে কর্ম্মযোগ জলে ভাসাইয়া দিতে হয়। শঙ্করাচার্য্যের যে তাহাই উদ্দেশ্য, ইহা বলা বাহুল্য। কর্ম্মযোগের কথা যখন পড়িবে, পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ত্ব একটা দার্শনিক মত। প্রাচীন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে এবং ধর্ম্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই অনিষ্টকারী। ধর্ম্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ হয় না। এই তত্ত্বটি সপ্রমাণ করিয়া কোম্‌ৎ ও তৎশিষ্যগণ দর্শন ও ধর্ম্ম উভয়েরই উপকার করিয়াছেন। আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়া উচিত।

দার্শনিক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্ম্মের সাধারণ মত—আত্মাই কর্ত্তা। ইহা প্রমাণ করিবার জন্য শত পৃষ্ঠা ধরিয়া বচন উদ্ধৃত করিতে পারা যায়। আমরা কেবল দুইটি কথা তুলিব। একটি উপনিষদ্ হইতে, আর একটি পুরাণ হইতে।

আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ।
নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি ॥ ১
স ইমাল্লোঁকানসৃজত অম্ভো মরীচীর্ম্মরমিত্যাদি।
ঋগ্বেদীয়ৈতরেয়োপনিষৎ।

আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই কর্ত্তা।

দ্বিতীয় উদাহরণ পুরাণ হইতে গ্রহণ করিতেছি। উহা কঠোপনিষদের শ্লোকের সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান করা কি যন্ত্রণা—

কঃ কেন হন্যতে জন্তুর্জন্তুঃ কঃ কেন রক্ষ্যতে।
হন্তি রক্ষতি চৈবাত্মা হ্যসৎ সাধু সমাচরন্ ॥
বিষ্ণুপুরাণ। ১। ১৮। ২৯

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১ ॥

যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ কাহাকে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়?। ২১।

ভাবার্থ—যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরের বিনাশ হইল না, সে যদি কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে "আমি ইহার বিনাশের কারণ হইলাম" বলিয়া দুঃখিত হয়। কেন না, আত্মা অবিনাশী। শরীরের বিনাশে তাহার বিনাশ হইল না।

তবে যদি বল যে, "ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, কিন্তু শরীরের ত বিনাশ আছেই। শরীরনাশেরই বা আমি কেন কারণ হই?" তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত হইতেছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অপর নূতন বস্ত্র* গ্রহণ করে, তেমনি আত্মা, পুরাতন শরীর পরিত্যাগ করিয়া নূতন শরীরে সংগত হয়। ২২।

---

* "It was if my soul were thinking separately from the body; she looked upon the *body as a foreign substance, as we look upon a garment.*" Wilhelm Meister, Carlyle's Translation. Book VI.

যে কয়টা কথা ইটালিক অক্ষরে লিখিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, গীতার কথাটা বেশ বুঝা যাইবে।

অর্থাৎ, যেমন তোমার জীর্ণ বস্ত্র কেহ ছিঁড়িয়া দিক বা না দিক, তোমাকে জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করিতেই হইবে, তেমনি তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, যোদ্ধৃগণ অবশ্য দেহত্যাগ করিবে, তোমার যুদ্ধবিরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ হইবে না। তবে কেন যুদ্ধ করিবে না ?

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, যে ব্যক্তি বধকার্য্য করিতে হইবে বলিয়া শোকমোহপ্রযুক্ত ধর্ম্মযুদ্ধ হইতে বিমুখ হয়, তাহার প্রতি এই সকল বাক্য প্রযোজ্য। নচেৎ আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহমাত্র নশ্বর, ইহার এমন অর্থ নহে যে, কেহ কাহাকে খুন করিলে তাহাতে দোষ নাই। খুন করিলে দোষ আছে কি না আছে—সে বিচারের সঙ্গে এ বিচারের কোন সম্বন্ধই নাই—থাকিতেও পারে না। এখানে বিবেচ্য, ধর্ম্মযুদ্ধে শোকমোহের কোন কারণ আছে কি না ? উত্তর—কারণ নাই, কেন না, আত্মা অবিনশ্বর, আর দেহ নশ্বর। দেহী কেবল নূতন কাপড় পরিবে মাত্র—তাহাতে কাঁদাকাটার কথাটা কি ?

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

এই (আত্মা) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পুড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে শুকায় না। ২৩।

আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অস্ত্রাদির অতীত।

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনীয় নহেন, এবং শোষণীয় নহেন। (ইনি) নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্য্য বলিয়া কথিত হন। ২৪।

স্থাণু—অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। অচল—পূর্ব্বরূপ অপরিত্যাগী। সনাতন—চিরন্তন, অনাদি। অব্যক্ত—চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অবিষয়। অচিন্ত্য—মনের অবিষয়। অবিকার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়।

শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করেন। আত্মা অচ্ছেদ্য ইত্যাদি, এজন্য আত্মা নিত্য ; নিত্য এজন্য সর্ব্বগত ; সর্ব্বগত এজন্য স্থিরস্বভাব ; স্থিরস্বভাব এজন্য অচল ; অচল এজন্য সনাতন, ইত্যাদি।

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া, শোক করিও না। ২৫।

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং* শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ ॥

আর যদি ইহা তুমি মনে কর, আত্মা সর্ব্বদাই জন্মে, সর্ব্বদা মরে, তথাপি হে মহাবাহো! ইহার জন্য শোক করিও না। ২৬।

কেন তথাপি শোক করিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী বলিয়া। পর-শ্লোকেও সেই কথা আছে। কিন্তু পরশ্লোকে, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" এই বাক্যে আত্মার অবিনাশিতাও সূচিত হইতেছে। তাহা হইলে আর, আত্মার বিনাশ স্বীকার করা হইল কৈ? এবং নূতন কথাই বা কি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন যে, আত্মাও যদি মরিল, তাহা হইলে তোমাকেও আর পাপপুণ্যের ফলভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় কি?

কেন তথাপি শোক করিবে না, তাহা পরশ্লোকে বলা হইতেছে।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

যে জন্মে, সে অবশ্য মরে; যে মরে, সে অবশ্য জন্মে; অতএব যাহা অপরিহার্য্য, তাহাতে শোক করিও না। ২৭।

আত্মার অবিনাশিতা গীতাকারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে। "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলিয়া মানিয়া লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, "ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।" যদি মরিলে আবার অবশ্য জন্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য অবিনাশী, "নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্" বলা আর খাটে না। তবে, শ্রীধরের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে এ আপত্তি উপস্থিত হয় না।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

জীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার) নিধনে অব্যক্ত; সেখানে শোকবিলাপ কি?। ২৮।

অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শঙ্কর অর্থ করেন, "অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধি-র্যেষাং ভূতানাং" অর্থাৎ যে (যে অবস্থায়) ভূতসকলের দর্শন বা উপলব্ধি নাই। শ্রীধর

* "নৈবং" পাঠান্তর।

অর্থ করেন, "অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপম্।" অর্থাৎ ভূত সকল উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণরূপে অব্যক্ত থাকে। অপর সকলে কেহ শ্রীধরের, কেহ শঙ্করের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়।

শ্লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাৎ জন্মের পূর্ব্বে চক্ষুরাদির অতীত ছিল; কেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর পর আবার চক্ষুরাদির অতীত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব কেন? "প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুম্বিব শোকো ন যুজ্যতে" (আনন্দগিরি)—ঘুম ভাঙ্গিলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জীবের জন্য শোক অনুচিত।

এখানেও আত্মার অবিনাশিত্ববাদ জাজ্বল্যমান।

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

এই (আত্মা)কে কেহ আশ্চর্য্যবৎ দেখেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ বলেন; কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যবৎ শুনিয়া থাকেন; শুনিয়াও কেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯।

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই। আত্মা অবিনাশী হইলেও পণ্ডিতেরাও মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাঁহারাও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন। আত্মা তাঁহাদের নিকট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র—তাঁহারা আশ্চর্য্য বিবেচনা করেন। আত্মার দুর্জ্ঞেয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি।

এ কথাতে এই আপত্তি হইতে পারে যে, "আত্মা অবিনাশী" এবং "ইন্দ্রিয়াদির অবিষয়" এই সকল কথাতে এমন কিছু নাই যে, পণ্ডিতেও বুঝিতে পারে না। কিন্তু ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য কেবল দুর্ব্বোধ্যতা প্রতিপাদন করা নহে। আমরা আত্মার অবিনাশিতা বুঝিতে পারিলেও, কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ করে না। তদ্বিষয়ক যে বিশ্বাস, তাহা আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না। এই বিশ্বাসকে আমরা একটা সর্ব্বদা-জাজ্বল্যমান, জীবন্ত, সর্ব্বথা-হৃদয়ে-প্রস্ফুটিত-ব্যাপারে পরিণত করি না। ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দেশ্য।

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ৩০ ॥

হে ভারত! সকলের দেহে, আত্মা নিত্য ও অবধ্য। অতএব জীব সকলের জন্য তোমার শোক করা উচিত নহে। ৩০।

আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহা কথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার।

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

স্বধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ভীত হইও না। ধর্ম্ম্যযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর নাই। ৩১।

এক্ষণে ১১ ও ২২ শ্লোকের টীকায় যাহা বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রিয় অর্থাৎ যুদ্ধব্যবসায়ীর স্বধর্ম্ম—যুদ্ধ। কিন্তু যোদ্ধার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ বলিয়া যে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এমন নহে। অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্ম্ম। অনেক রাজা পরস্বাপহরণ জন্যই যুদ্ধ করেন। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ধর্ম্মানুমত নহে। কিন্তু যে যুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্যসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। যোদ্ধৃগণ রাজা বা সেনাপতির আজ্ঞানুবর্ত্তী। তাঁহাদের আজ্ঞামত যুদ্ধ করিতে, অধীন যোদ্ধৃমাত্রেই বাধ্য। কিন্তু সে অবস্থায় যুদ্ধ করিলেও তাঁহারা পরস্বাপহরণ ইত্যাদি পাপের অংশী হয়েন। এই অধর্ম্মযুদ্ধই অনেক। যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কৃতি পান না। ভীষ্মের ন্যায় পরমধার্ম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ দুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক অধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কথা এই মহাভারতেই আছে। ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খুঁজিলে ভীষ্মের অবস্থাপন্ন লোক সহস্র সহস্র পাওয়া যাইবে। অতএব যোদ্ধার এই মহৎ দুর্ভাগ্য যে, স্বধর্ম্মপালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয়। ধার্ম্মিক যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা করেন। কিন্তু ধর্ম্মযুদ্ধও আছে। আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, ধর্ম্মরক্ষার জন্যও যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এইরূপ যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্ম্ম সঞ্চয় না হইয়া পরম ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্ম্মপালন নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয়। এরূপ ধর্ম্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম ভাগ্যবান্। অর্জ্জুনের সেই সময় উপস্থিত, এরূপ যুদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্ম্ম—অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগ। অর্জ্জুন সেই অনর্থক স্বধর্ম্মপরিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্ম্মে প্রবৃত্ত। ইহার কারণ আর কিছু নহে। কেবল স্বজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভীত শোকাকুল বা মুগ্ধ হইবার কোন কারণ নাই, তাহা ভগবান্ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে, কেহ মরিবে

না—কেন না, দেহী অমর। যাইবে কেবল শূন্যদেহ, কিন্তু সেটা ত জীর্ণ বস্ত্র মাত্র। অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্ম্মে উপেক্ষা অকর্ত্তব্য। এই ধর্ম্ম্যযুদ্ধের মত এমন মঙ্গলময় ব্যাপার ক্ষত্রিয়ের আর ঘটে না। ইহাই শ্লোকার্থ।

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ ঈদৃশ যুদ্ধ, আপনা হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সুখী ক্ষত্রিয়েরাই ইহা লাভ করিয়া থাকে। ৩২।

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আর যদি তুমি এই ধর্ম্ম্য যুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগে পাপযুক্ত হইবে। ৩৩।

৩১ শ্লোকের টীকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। সমর্থ ব্যক্তির অকীর্ত্তির অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। ৩৪।

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫ ॥

মহারথগণ মনে করিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে। যাঁহারা তোমাকে বহুমান করেন, তাঁহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে। ৩৫।

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬ ॥

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাচ্য কথা বলিবে। তার পর অধিক দুঃখ আর কি আছে? । ৩৬।

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হত হইলে স্বর্গ পাইবে। জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব, হে কৌন্তেয়! যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া উত্থান কর। ৩৭।

৩৪।৩৫।৩৬।৩৭, এই চারিটি শ্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা যায় না। এই চারিটি শ্লোক গীতার অযোগ্য। গীতায় ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক তত্ত্বও আছে। এই চারিটি শ্লোকের বিষয় না ধর্ম্ম, না দার্শনিক তত্ত্ব। ইহাতে বিষয়ী লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার করে, তাহা ভিন্ন আর কিছু নাই। ইহা ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

৩৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত ভগবান্ অর্জ্জুনকে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন। ৩৮ শ্লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কর্ম্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে। এই চারিটি শ্লোকের সঙ্গে, দুইয়ের একেরও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তৎপরিবর্ত্তে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শিত হইতেছে। বলা বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় কোন প্রকার ধর্ম্ম নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সকলে ধর্ম্ম এতই দুর্ব্বল যে, অনেক সময়ে লোক-নিন্দা-ভয়ই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। অনেক চোর চৌর্য্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল লোক-নিন্দা-ভয়ে চুরি করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে। তাহা হইলেও ইহা ধর্ম্ম হইল না; পিতলকে গিল্টি করিলে দুই চারি দিন সোনা বলিয়া চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই লোকনিন্দা বহুতর পাপের কারণ। আজিকাব দিনে হিন্দুসমাজের ভ্রূণহত্যা ও স্ত্রীহত্যা অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন। এক সময়ে ফরাসীর দেশে উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল। সিয়াপোষ কাফরদিগের মধ্যে, যে এক জনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাৎ যে নরঘাতী নহে, সে সমাজে নিন্দিত—তাহার বিবাহ হয় না। সকল সমাজেরই সহস্র সহস্র পাপ লোক-নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন; কেন না, সাধারণ লোক নির্ব্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা করিয়া থাকে। লো যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বলিয়াই, মনুষ্যের ধর্ম্মাচরণে অবসর বা তৎপ্রতি মনোযোগ নাই। লোক-নিন্দা-ভয়ে অনেকে যে ধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অসার লোকে লোক-নিন্দা-ভয় প্রদর্শন করে, ইহা সচরাচর দেখা গিয়া থাকে। যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সে সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্ স্বয়ং যে অর্জ্জুনকে সেই মহাপাপে উপদিষ্ট করিবেন, ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই ইহা ঈশ্বরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; কেন

না, গীতাকার যেই হউন, তিনি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধর্ম্মে সুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি তাঁহা হইতেও সম্ভবে না। যদি কেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শঙ্কর এই কয় শ্লোককে "লৌকিক ন্যায়" বলিয়াছেন। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি "লৌকিক ন্যায়" পরিত্যাগ না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই কোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার কথার পর, ও পৃথিবীভোগের কথার পরেই "এষাতেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে" ইত্যাদি কথা অসংলগ্ন বোধ হয় বটে। অতএব যাঁহারা এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নহি।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, তথাপি ইহা স্বার্থবাদ-পরিপূর্ণ। স্বর্গ বা রাজ্যের প্রলোভন দেখাইয়া ধর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, আর ছেলেকে মিঠাই দিব বলিয়া সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত করা, তুল্য কথা। উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থপরতার উত্তেজনা মাত্র।

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অতএব, সুখদুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্যজ্ঞান করিয়া যুদ্ধার্থ উদ্‌যুক্ত হও। নচেৎ পাপযুক্ত হইবে। ৩৮।

যুদ্ধই যদি স্বধর্ম্ম, অতএব অপরিহার্য্য, তবে তাহাতে সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয়, সমান জ্ঞান করিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে, কেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা অনুষ্ঠেয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য—করিলে সুখ হইবে কি দুঃখ হইবে, লাভ হইবে কি অলাভ হইবে, ইহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য নহে। ইহাই পশ্চাৎ কর্ম্মযোগ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

পাঠক দেখিবেন, ৩৭শ শ্লোকের পর আবার সুর ফিরিয়াছে। এখন যথার্থ ভগবদ্-গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই যথার্থ কৃষ্ণের বংশীরব। ৩৪-৩৭শ শ্লোক ও ৩৮শ শ্লোকে কত প্রভেদ!

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল। (কর্ম্ম) যোগে ইহা (যাহা বলিব) শ্রবণ কর। তদ্দ্বারা যুক্ত হইলে, হে পার্থ! কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে। ৩৯।

প্রথম—সাংখ্য কি? "সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা। সম্যগ্‌-জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্।" (শ্রীধর)। যাহার দ্বারা বস্তুতত্ত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহা সংখ্যা। তাহার সম্যগ্‌জ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ত্ব সাংখ্য। সচরাচর সাংখ্য নামটি এক্ষণে দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পণ্ডিতেরা গুরুতর ভ্রমে পড়িয়া থাকেন। বস্তুতঃ এই গীতাগ্রন্থে সাংখ্য শব্দ "তত্ত্বজ্ঞান" অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বলিয়া বোধ হয়।

দ্বিতীয়—যোগ কি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কপিল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে পাতঞ্জল-দর্শনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,* এক্ষণে সচরাচর যোগ বলিলে তাহাই আমরা বুঝিয়া থাকি। কিন্তু গীতায় যোগ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা হইলে, "কর্ম্মযোগ" "ভক্তিযোগ" ইত্যাদি শব্দের কোন অর্থ হয় না। বস্তুতঃ, গীতায় "যোগ" শব্দটি সর্ব্বত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। সচরাচর ইহা গীতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনবিশেষই যোগ। জ্ঞান, ঈদৃশ একটি উপায় বা সাধন, কর্ম্ম তাদৃশ উপায়ান্তর, ভক্তি তৃতীয়, ইত্যাদি—এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হইয়া থাকে। সচরাচর এই অর্থ, কিন্তু এ শ্লোকে সে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে "যোগ" অর্থে কর্ম্মযোগ। এই অর্থে "যোগ" "যোগী" "যুক্ত" ইত্যাদি শব্দ গীতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব। স্থানান্তরে "যোগ" শব্দে জ্ঞান-যোগাদিও বুঝাইতে দেখা যাইবে।

অতএব এই শ্লোকের দুইটি শব্দ বুঝিলাম—সাংখ্য, জ্ঞান; এবং যোগ, কর্ম্ম। এক্ষণে মনুষ্যপ্রকৃতির কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক।

মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা, তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—Thought, Action and Feeling. আমরা না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতাবলম্বী নাই হইলাম, তথাপি আমরা নিজেই মনুষ্যজীবন আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিব যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে পারে; তিনই ঈশ্বরার্পিত হইলে ঈশ্বরসমীপে লইয়া যাইতে পারে। Thought ঈশ্বরমুখ

* যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।

হইলে জ্ঞানযোগ ; Action ঈশ্বরমুখ হইলে কর্ম্মযোগ ; Feeling ঈশ্বরমুখ হইলে ভক্তি-যোগ। ভক্তিযোগের কথা এখন থাক। ৩৪ শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞানের কথা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইলেন ; এই দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামই "সাংখ্যযোগ"।* জ্ঞানে অর্জ্জুনকে উপদিষ্ট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক† হইতে কর্ম্মে উপদিষ্ট করিতেছেন। কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন।

ভাষ্যকারেরা বলেন, এই কর্ম্ম, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় (শঙ্কর)। অর্থাৎ প্রথমে তত্ত্বজ্ঞান কি, তাহা অর্জ্জুনকে বুঝাইয়া, "যদি অর্জ্জুনের তত্ত্বজ্ঞান অপরোক্ষ না হইয়া থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত এই কর্ম্মযোগ" কহিতেছেন (হিতলাল মিশ্র)। বলা বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে এখানে নাই। তবে স্থানান্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা—

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। ৩। ৬

কিন্তু আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে

ইত্যাদি। ৫। ৬। ৫

এ সকল কথার মর্ম্ম পশ্চাৎ বুঝা যাইবে।

এই শ্লোকে কর্ম্মযোগের ফলও কথিত হইতেছে। এই ফল "কর্ম্মবন্ধ" হইতে মোচন। কর্ম্মবন্ধ কি? কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তরবাদীরা বলেন, এ জন্মে যাহা করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। যদি আর পুনর্জ্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা হইলেই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল। অতএব মোক্ষপ্রাপ্তই কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত।

কিন্তু যে জন্মান্তর না মানে, সেও কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি এ জীবনের চরমোদ্দেশ্য বলিয়া মানিতে পারে। পরকালে বা জন্মান্তরে কি হইবে, তাহা জানি না, কিন্তু আমরা সকলেই জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সকল কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি। আমরা সকলেই জানি যে, হিম লাগাইলে ইহজন্মেই সর্দ্দি হয়। আমরা সকলেই জানি যে, রোগের চিকিৎসা করিলে রোগ আরাম হয়। সকলেই জানি যে, আমরা যদি কাহারও শত্রুতা করি, তবে সেও ইহজীবনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং আমরা যদি কাহারও উপকার করি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রত্যুপকার করার সম্ভাবনা। সকলেই জানে, ধনসঞ্চয়

* চতুর্থাধ্যায়ের নাম "জ্ঞানযোগ"। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জানা যাইবে।

† মধ্যের চারিটি শ্লোক তবে কি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় না?

করিলেই ইহজন্মেই "বড়মানুষী" করা যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন করিলেই ইহজন্মেই বিদ্যালাভ করা যায়। সকল প্রকার কর্ম্মের ফল, ইহজন্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে।

তবে কতকগুলি কর্ম্ম আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশা করিতে আমরা শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ম্মগুলিকে সচরাচর পাপ পুণ্য বলিয়া থাকে। তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা করিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহা ইহজন্মে পাই না বটে। আমরা শিখিয়াছি যে, দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ইহজীবনে কাহারও স্বর্গলাভ হয় না। কেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দ্ধগুণও পাওয়া যায় না। শুনা আছে, চুরি করিলে একটা ঘোরতর পাপ হয়। কিন্তু ইহজীবনে চুরি করিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না—সকলে সে পাপের কোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সকলে দেখিতে পায় না বলিয়া ইহজীবনে চুরির কোন প্রকার দণ্ড নাই—কর্ম্মফলভোগ নাই, এমন নহে; এবং দানের যে কোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে। চিত্তপ্রসাদ আছে—পুনঃপুনঃ দানে আপনার চিত্তের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ পুণ্যে ইহজীবনে কিরূপ সমুচিত কর্ম্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইয়াছি,* পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। যাঁহাদের ইচ্ছা হইবে, সেই গ্রন্থে দৃষ্টি করিবেন।

সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াছি যে, সম্পুর্ণ ধর্ম্মাচরণের দ্বারা ইহজীবনেই মুক্তিলাভ করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং কিরূপেই লাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। সে সকল কথা আর এখানে পুনরুক্ত করিব না। ফলে জীবন্মুক্তি হিন্দুধর্ম্মের বহির্ভূত তত্ত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বুঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাও দেখিব। সুতরাং যাঁহারা জন্মান্তর মানেন না, তাঁহারাও কর্ম্মযোগের দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন। গীতোক্ত ধর্ম্ম বিশ্বলৌকিক, ইহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে।

উপসংহারে বলা কর্ত্তব্য যে, আর এক কর্ম্মফলের কথা আছে। হিন্দুরা যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন—কর্ম্মফল পাইবার জন্য। এই সকলের ইহলোকে যে কোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথা আমরা বলি না। একাদশীব্রত করিলে শারীরিক স্বাস্থ্যলাভ করা যায়, এবং অন্যান্য যাগযজ্ঞের ও ব্রতাদির কোন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে। তবে হিন্দুরা সচরাচর যে সকল ফল কামনা

* ধর্ম্মতত্ত্ব।

করিয়া এই সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহা এ জন্মে পাওয়া যায় না বটে। ভরসা করি, এ টীকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যিনি এ প্রশ্নের কোন উত্তর প্রত্যাশা করিবেন।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

এই (কর্ম্মযোগে) প্রারম্ভের নাশ নাই ; প্রত্যবায় নাই ; এ ধর্ম্মের অল্পতেই মহদ্ভয় হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। ৪০।

জ্ঞান সম্বন্ধে এরূপ কথা বলা যায় না। কেন না, অল্পজ্ঞানের কোন ফলোপধায়িতা নাই ; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ—সামান্য জ্ঞানীর ঈশ্বরানুসন্ধানে নাস্তিকতা উপস্থিত হইয়া থাকে, এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে।

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥ ৪১ ॥

হে কুরুনন্দন। ইহাতে (কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধি একই হইয়া থাকে। কিন্তু অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাখাযুক্ত ও অনন্ত হইয়া থাকে। ৪১।

শ্রীধর বলেন, "পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব," এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। ইহা একই হয়, অর্থাৎ একনিষ্ঠই হয়, নানা বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহারা অব্যবসায়ী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরারাধনাবহির্মুখ, এবং সকাম, তাহাদের কামনা সকল অনন্ত, এবং কর্ম্মফল-গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখা ও অনন্ত হয়, অর্থাৎ কত দিকে যায়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা কামনাপরবশ, এবং কামনাপরবশ হইয়াই কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়।

কথাটার স্থূল তাৎপর্য্য এই। ভগবান্ কর্ম্মযোগের অবতারণা করিতেছেন, কিন্তু অর্জ্জুন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই কর্ম্মযোগ, কেন না, তৎকালে বৈদিক কাম্যকর্ম্মই কর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। কর্ম্ম বলিলে সেই সকল কর্ম্মই বুঝায়। অতএব প্রথমেই ভগবান্ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্যকর্ম্ম কর্ম্মযোগ নহে, তাহার বিরোধী। কর্ম্ম কি, তাহা পশ্চাৎ বলিবেন, কিন্তু তাহা বলিবার আগে এ বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচলিত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥

হে পার্থ! অবিবেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকর্ম্মফলপ্রদ, ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল বাক্য বলে, যাহারা বেদবাদরত, "(তদ্ভিন্ন) আর কিছুই নাই" যাহারা ইহা বলে, তাহারা কামাত্মা, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত অপহৃত; তাহাদের বুদ্ধি সমাধিতে সংশয়বিহীন হয় না। ৪২। ৪৩। ৪৪।

এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্ত্তী দুই শ্লোকের ও ৫৩ শ্লোকের বিশেষ প্রাধান্য আছে; কেন না, এই ছয়টি শ্লোকে একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। এবং গীতার এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয়। অতএব ইহার প্রতি পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি। *

প্রথমতঃ শ্লোকত্রয়ে যে কয়টা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝা যাউক।

কাম্যকর্ম্মের কথা হইতেছিল। এখনও সেই কথাই হইতেছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে আপাতশ্রুতিসুখকর বলা হইতেছে; কেন না, বলা হইয়া থাকে যে, এই করিলে স্বর্গলাভ হইবে, এই করিলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত্যাদি।

সেই সকল কথা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শঙ্কর ইহার এইরূপ অর্থ করেন, "জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং, তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা।" জন্মই কর্ম্মের ফল, যাহা তাহা প্রদান করে, তাহা "জন্মকর্ম্মফলপ্রদ।" শ্রীধর ভিন্ন প্রকার অর্থ করেন, "জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি।" জন্ম, তথা কর্ম্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে

---

* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহভঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের অনুবাদককৃত অনুবাদও এস্থলে দেওয়া গেল। উহা অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় না, কিন্তু বিশদ বটে।

"যাহারা আপাতমনোহর শ্রবণরমণীয় বাক্যে অনুরক্ত; বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাক্যই যাহাদের প্রীতিকর; যাহারা স্বর্গাদি ফলসাধন কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকার করে না; যাহারা কামনাপরায়ণ; স্বর্গই যাহাদের পরমপুরুষার্থ; জন্ম কর্ম্ম ও ফলপ্রদ ভোগ ও ঐশ্বর্য্যের সাধনভূত নানাবিধ ক্রিয়াপ্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে; এবং যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে একান্ত সংসক্ত; সেই বিবেকবিহীন মূঢ়দিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শূন্য হয় না।"

প্রদান করে। অনুবাদকেরা কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। দুই অর্থ ই গ্রহণ করা যাইতে পারে।

তার পর ঐ কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথাকে "ভোগৈশ্বর্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল" বলা হইয়াছে। ইহা বুঝিবার কোন কষ্ট নাই। ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য ক্রিয়াবিশেষের বাহুল্য ঐ সকল বিধিতে আছে, এইমাত্র অর্থ।

কথা এইরূপ। যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহারা "বেদবাদরত।" বেদেই এই সকল কাম্যকর্ম্মবিষয়িণী কথা আছে—অন্ততঃ তৎকালে বেদেই ছিল; এবং এখনও ঐ সকল কর্ম্ম বেদমূলক বলিয়াই প্রসিদ্ধ ও অনুষ্ঠেয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী, তাহারা বেদেরই দোহাই দেয়—বেদ ছাড়া "আর কিছু নাই" ইহাই বলে। অর্থাৎ বেদোক্ত কাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম্ম, তাহা ভিন্ন আর কিছু ধর্ম্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা "কামাত্মা" বা কামনাপরবশ—"স্বর্গপর", অর্থাৎ স্বর্গই তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে তাহাদের মতি নাই, মোক্ষলাভে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা নাই। তাহারা ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যে আসক্ত—সেই জন্যই স্বর্গকামনা করে, কেন না, স্বর্গ একটা ভোগৈশ্বর্য্যের স্থান বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস আছে। কাম্যকর্ম্মবিষয়ক পুষ্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মূঢ়। সমাধিতে—ঈশ্বরে চিত্তের যে অভিমুখতা বা একাগ্রতা—তাহাতে, এবংবিধ বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না।

শ্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি। বেদে নানাবিধ কাম্যকর্ম্মের বিধি আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বহুপ্রকার কাম্যকর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি বহুবিধ ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তি হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী। যাহারা কামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য স্বর্গাদি কামনা করে, তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, বলে ইহা ছাড়া আর ধর্ম্ম নাই। তাহারা মূঢ়। তাহাদের বুদ্ধি কখন ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পারে না। কেন না, তাহাদের বুদ্ধি "বহুশাখা" ও "অনন্তা", ইহা পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে।

কথাটা বড় ভয়ানক ও বিস্ময়কর। ভারতবর্ষ এই ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বেদ-শাসিত। আজিও বেদের যে প্রতাপ, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহার সহস্রাংশের এক অংশ নাই। সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহস্র গুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনকার ঈশ্বর মানেন না—ঈশ্বর নাই, এ কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিতে সাহস করিয়াছেন, তিনিও বেদ অমান্য করিতে সাহস করেন না—পুনঃপুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ়, বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার অযোগ্য।

ইহার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে, আর দুইটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমতঃ, কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক-কর্ম্মবাদীদিগের নিন্দা। যাহারা বলে, বেদোক্ত কর্ম্মই (যথা, অশ্বমেধাদি) ধর্ম্ম, কেবল তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই নিন্দা। কিন্তু বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি আছে, আর কিছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অত্যুন্নত ব্রহ্মবাদ আছে, গীতা সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনী, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত, ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মবাদ ও ভক্তিবাদের সহিত সমঞ্জসীভূত হইয়াছে। অতএব কৃষ্ণের এতদুক্তিকে সমস্ত বেদের নিন্দা বিবেচনা করা অনুচিত। তবে, দ্বিতীয় কথা এই বক্তব্য যে, যাঁহারা বলেন যে, বেদে যাহা আছে তাহাই ধর্ম্ম, তাহা ছাড়া আর কিছু ধর্ম্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের মধ্যে নহেন। তিনি বলেন, (১) বেদে ধর্ম্ম আছে, ইহা মানি। (২) কিন্তু বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম নহে—যথা, এই সকল জন্মকর্ম্মফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবহুলা পুষ্পিতা কথা। (৩) তিনি আরও বলেন যে, যেমন এক দিকে, বেদে এমন অনেক কথা আছে যাহা ধর্ম্ম নহে, আবার অপর দিকে অনেক তত্ত্ব যাহা প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব, অথচ বেদে নাই। ইহার উদাহরণ আমরা গীতাতেই পাইব। কিন্তু গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কর্ণপর্ব্ব হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রুতের্ধর্ম্ম ইতি হ্যেকে বদন্তি বহবো জনাঃ।
তত্তে ন প্রত্যসূয়ামি ন চ সর্ব্বং বিধীয়তে ॥ ৫৬ ॥
প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্ম্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥*

যদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দা বলিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতার এবং মহাভারতের অন্যত্র বেদনিন্দা আছে। বস্তুতঃ ইহা এই পর্য্যন্ত বেদনিন্দা যে, এতদ্দ্বারা বেদের অসম্পূর্ণতা সূচিত হয়।

---

* "অনেকে শ্রুতিকে ধর্ম্মপ্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ করি না। কিন্তু শ্রুতিতে সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা অনেক স্থলে ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিতে হয়।" কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ—কর্ণপর্ব্ব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কাপি দেখিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক দুটি ৭০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্যত্র ৬৯ অধ্যায়ে ইহা পাওয়া যায়।

তত দূর ইহাকে না হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক। এই বেদনিন্দার ভিতর একটা ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মৎপ্রণীত "ধর্ম্মতত্ত্ব" গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। কিন্তু ঐ গ্রন্থ সম্প্রতি মাত্র প্রচারিত হইয়াছে। এজন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে পারে। অতএব প্রয়োজনীয় অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্যদেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বৈদিক ধর্ম্মে উপাস্য-উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল। 'হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর। হবি ভোজন কর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ দাও, পুত্র দাও, গোরু দাও, শস্য দাও, আমার শত্রুকে পরাস্ত কর।' বড় জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।' দেবগণকে এইরূপ অভিপ্রায়ে প্রসন্ন করিবার জন্য বৈদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন। এইরূপ কাম্য বস্তুর উদ্দেশে যজ্ঞাদি করাকে কাম্যকর্ম্ম বলে।

কাম্যাদি কর্ম্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম্ম। এই কাজ করিলে, তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে—এইরূপ ধর্ম্মার্জ্জনের যে পদ্ধতি, তাহারই নাম কর্ম্ম। বৈদিক কালের শেষভাগে এইরূপ কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। যাগযজ্ঞের দৌরাত্ম্যে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। এমন অবস্থায়, উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ম্মাত্মক ধর্ম্ম বৃথা ধর্ম্ম। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বৈদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। তাঁহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন।

এই সকল কারণে কর্ম্মের উপর অনেকে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তাঁহারা ত্রিবিধ বিপ্লব উপস্থিত করিলেন। সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়া প্রদেশ অদ্যাপি শাসিত। এক দল চার্ব্বাক—তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম কাণ্ড সকলই মিথ্যা—খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নেতা শাক্যসিংহ—তিনি বলিলেন, কর্ম্মফল মানি বটে, কিন্তু কর্ম্ম হইতেই দুঃখ। কর্ম্ম হইতে পুনর্জ্জন্ম। অতএব কর্ম্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্ব্বক অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মপথে গিয়া নির্ব্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব দার্শনিকদিগের দ্বারা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা প্রায় ব্রহ্মবাদী। তাঁহারা দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভূত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাঁহারা প্রবৃত্ত, তাহা অতিশয় দুর্জ্জেয়। সেই ব্রহ্ম জানিতে পারিলে—সেই জগতের অন্তরাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গেই বা তাঁহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পারিলে, বুঝা যাইতে

পারে যে, এ জীবন লইয়া কি করিতে হইবে। সেটা কঠিন—তাহা জানাই ধর্ম্ম। অতএব জ্ঞানই ধর্ম্ম—জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে উপনিষদ্ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কীর্ত্তি। ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানই উপনিষদ্ সকলের উদ্দেশ্য। তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও বিবর্দ্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে। কপিলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পরিত্যক্ত হইলেও সে দর্শনশাস্ত্র জ্ঞানবাদাত্মক।"

শ্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদীদিগের মধ্যে। কিন্তু অন্য জ্ঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, অনন্তজ্ঞানী তাহা দেখিয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য। তিনি আরও দেখিয়াছিলেন, ধর্ম্মের অন্য পথও আছে; অধিকারীভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষা সুসাধ্য। পরিশেষে ইহাও দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন, জ্ঞানমার্গ, এবং অন্যমার্গ, পরিণামে সকলই এক। এই কয়টি কথা লইয়া গীতা।

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥ ৪৫ ॥

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল ত্রৈগুণ্যবিষয়; তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও। নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্ হও। ৪৫।

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্দগুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে তাহার কিছুই পরিষ্কার করা গেল না। প্রথম, "ত্রৈগুণ্যবিষয়" কি? সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণ; ইহার সমষ্টি ত্রৈগুণ্য। এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দেখি? সংসারে। সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (Subject) তাহাই "ত্রৈগুণ্যবিষয়।" সংসারই বেদের বিষয়, এই জন্য বেদ সকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়।"

শঙ্করাচার্য্য এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ।" ইহাও একটু বেদনিন্দার মত শুনায়। অতএব, শঙ্করের টীকাকার আনন্দগিরি প্রমাদ গণিয়া সকল দিক্ বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন, "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে। তদভ্যাসবতাং তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরোঽস্তীত্যর্থঃ।" অর্থাৎ "এখানে বেদ শব্দের অর্থে কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। যাহারা তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা সংসারধ্রৌব্য হেতু বিবেকের অবসর থাকে না।" বেদের কতটুকু কর্ম্মকাণ্ড, আর কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সে বিষয়ে কোন ভ্রম না ঘটিলে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের কোন আপত্তি নাই।

শ্রীধরস্বামী বলেন, "ত্রিগুণাত্মকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধ-প্রতিপাদকা বেদাঃ।" এই ব্যাখ্যা অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল মিশ্র বুঝাইয়াছেন যে, "ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সকাম অধিকারীদিগের নিমিত্তই (!) বেদ সকল কর্ম্মফল সম্বন্ধে প্রতিপাদক হয়েন।" এবং শ্রীধরের বাক্যেরই অনুসরণ করিয়া কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই শ্লোকার্দ্ধের অনুবাদ করিয়াছেন যে, "বেদসকল সকাম ব্যক্তিদিগের কর্ম্মফলপ্রতিপাদক।" অন্যান্যেও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

উভয় ব্যাখ্যা মর্ম্মতঃ এক। সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, "হে অর্জ্জুন! বেদ সকল সংসারপ্রতিপাদক বা কর্ম্মফলপ্রতিপাদক। তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া সাংসারিক বিষয়ে বা কর্ম্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও।" কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ করিয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান্ অর্জ্জুনকে সাংখ্যযোগ বুঝাইয়া তৎপরে কর্ম্মযোগ বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্মযোগ কি, তাহা এখনও বলেন নাই। কেন না, কর্ম্ম সম্বন্ধে যে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচলিত ছিল, (এবং এখনও আছে) প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্ত্তব্য। নহিলে প্রকৃত কর্ম্ম কি, অর্জ্জুন তাহা বুঝিবেন না। সে সাধারণ ভ্রম এই যে, বেদে যে সকল যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা কথিত ও বিহিত হইয়াছে, তাহাই কর্ম্ম। ভগবান্ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কর্ম্ম নহে। বরং যাহারা ইহাতে চিত্তনিবেশ করে, ঈশ্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় না। এজন্য প্রকৃত কর্ম্মযোগীর পক্ষে উহা কর্ম্ম নহে। এই ৪৫শ শ্লোকে সেই কথাই পুনরুক্ত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন যে, বেদ সকল যাহারা সংসারী অর্থাৎ সংসারের সুখ খোঁজে, তাহাদিগেরই অনুসরণীয়। তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজিও না। ত্রৈগুণ্যের অতীত হও।

কি প্রকারে ত্রৈগুণ্যের অতীত হইতে পারা যায়, শ্লোকের দ্বিতীয় অর্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। ভগবান্ বলিতেছেন—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও, নিত্যসত্ত্বস্থ হও, যোগ-ক্ষেম-রহিত হও এবং আত্মবান্ হও। এখন এই কটা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয়।

১। নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিকে দ্বন্দ্ব বলে, তাহা পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। যে সে সকল তুল্য জ্ঞান করে, সেই নির্দ্বন্দ্ব।

২। নিত্যসত্ত্বস্থ—নিত্য সত্ত্বগুণাশ্রিত।

৩। যোগ-ক্ষেম-রহিত—যাহা অপ্রাপ্ত তাহার উপার্জ্জনকে যোগ বলে, আর যাহা প্রাপ্ত তাহার রক্ষণকে ক্ষেম বলে। অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হও।

৪। আত্মবান্—অথবা অপ্রমত্ত।*

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬॥

এখানে এই শ্লোকের অনুবাদ দিলাম না। টীকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে। কেন না, এই শ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপত্তি ঘটে; সে সকলের মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে।

আমি এই শ্লোকের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুঝাইব।

প্রথম। যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত, এবং শঙ্কর ও শ্রী[illegible]রাদির অনুমোদিত, তাহাই অগ্রে বুঝাইব।

দ্বিতীয়। আর একটি নূতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমীপে তাঁহার [illegible]ার জন্য উপস্থিত করিব। সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিবেন।

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদকেরা যেরূপ ব্যাখ্যা [illegible]রিয়াছেন, তাহাও বুঝাইব।

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই :—

১ম। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকেরা এই অর্থ করিয়াছেন। ইহার কোন মানে হয় না।

২য়। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ। এই ব্যাখ্যা নূতন।

---

* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূলসঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ [illegible]রলাম। কিন্তু যাঁহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই শ্লোকের অর্থ করিতে চান, তাঁহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্ব[illegible] বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থই গ্রহ[illegible] করিবেন।

"শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয়—অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য, তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়কে নির্দ্দেশ করিয়া উদ্দিষ্ট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্থূল তারা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করে, কিন্তু নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদ সকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণতত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব [illegible] করতঃ নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমোগুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নির্গুণ ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময় মানাপমানাদি দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্য সত্ত্ব অর্থাৎ আমার ভক্তগণের সঙ্গ করতঃ কর্ম্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর।"

অন্বয়। উদপানে যাবানর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে তাবানর্থঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচীন এবং প্রচলিত।

অগ্রে প্রচলিত ব্যাখ্যাই বুঝাইব। কিন্তু বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া যায় নাই; তদভাবে যাঁহারা সংস্কৃত না জানেন, তাঁহাদের অসুবিধা হইতে পারে, এজন্য প্রচলিত ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যাহা হইতে জলপান করা যায়, তাহা উদপান শব্দে বাচ্য, অর্থাৎ পুষ্করিণী এবং কূপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু সেই সেই সমস্ত কূপাদি পরিভ্রমণ করিলে, পৃথক্ পৃথক্ যে প্রকার স্নান পানাদি প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংপ্লুতোদক শব্দবাচ্য এক মহাহ্রদে একত্র যেমন নির্ব্বাহ হইতে পারে, তদ্রূপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলরূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবদ্ভক্তিযুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তির তদ্দ্বারাই সম্পন্ন হয়।"

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের পথিক হইয়াছেন। শ্রীধর-কৃত ব্যাখ্যা আমরা উদ্ধৃত করিতেছি।

"উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি। তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাত্তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো **যাবান্** স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি **তাবান্** সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং **যাবান্** সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্**তাবান্** সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব।"

ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগুলিন পরিভ্রমণ করিলে **যাবৎ** পরিমিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাহ্রদেই **তাবৎ** প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ, সমস্ত বেদে **যাবৎ** প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠায় **তাবৎ** প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। *

---

* শঙ্করাচার্য্য-ব্যবহৃত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সন্ন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্বং বিজানতো যোঽর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে ইত্যাদি।" ইহার ভিতর অন্য যে কল কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বুঝাইব। সম্প্রতি "সর্ব্বেষু বেদেষু" ইহার যেরূপ অর্থ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য করিয়াছেন, তৎপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থ "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।" যে কারণে আনন্দগিরি বলিয়াছেন "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে", সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু।"

আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধি, এই ব্যাখ্যা বুঝিতে গিয়া যে গোলযোগে পড়িয়াছি, প্রাচীন মহামহোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্মবন্দনাপূর্ব্বক আমি তাহা নিবেদন করিতেছি। যে আপনার সন্দেহ ব্যক্ত করিতে সাহস না করে, তাহার কোন জ্ঞানই জন্মে নাই। এবং জন্মিবারও সম্ভাবনাও নাই।

'যাবৎ' 'তাবৎ' শব্দ পরিমাণবাচক। কিন্তু কেবল যাবৎ বলিলে কোন পরিমাণ বুঝা যায় না। একটা যাবৎ থাকিলেই তার একটা তাবৎ আছেই। একটা তাবৎ থাকিলেই তার একটা যাবৎ আছেই। এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, কেবল "যাবৎ" শব্দটা স্পষ্ট, তাহার পরবর্ত্তী "তাবৎ"-কে বুঝিয়া লইতে হয় ; যথা—"আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও।" ইহার প্রকৃত অর্থ, "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও।" অতএব স্পষ্টই হউক, আর উহ্যই হউক, যাবৎ থাকিলেই তাবৎ থাকিবে। তদ্রূপ তাবৎ থাকিলেই যাবৎ থাকিবে।

এই যাবৎ তাবৎ শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তুর সঙ্গে যাবৎ থাকে, আর যাহার সঙ্গে তাবৎ থাকে, উভয়ের পরিমাণ এক বা সমান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। অতএব যাবৎ তাবৎ থাকিলে দুইটি তুল্য বা তুলনার বস্তু আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। "আমি যাবৎ না আসি, (তাবৎ) তুমি এখানে থাকিও" এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, "আমার পুনরাগমন পর্য্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবস্থিতিকাল, উভয়ে সমান হইবে।" এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনীয়।

এইরূপ যেখানে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিতে হইতেছে। যদি তার পর আবার যাবান্ তাবান্ দেখি, তবে অবশ্য বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি বিষয় পরস্পর তুলিত হইতেছে। ইহার অন্যথা কদাচ হইতে পারে না।

এখন, এই শ্লোকের মূলে মোটে একটি যাবান্ আর একটি তাবান্ আছে ; অতএব বুঝিতে হইবে, দুইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (১) উদপানে বা সঙ্কীর্ণ জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে যাবৎ পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থাবিশেষে তাবৎ প্রয়োজন। কিন্তু প্রাচীন টীকাকারদিগের কৃত যে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে দেখি যে, দুইটা যাবান্ এবং দুইটা তাবান্। * অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রথমে দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত হইলে পর, আবার দুইটা বস্তু পরস্পর তুলিত

* বড় বড় অক্ষরে এই চারিটা শব্দ ছাপিয়াছি, পাঠক মিলাইয়া দেখিবেন।

হইয়াছে। প্রথম, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুলিত না হইয়া মহাহ্রদের সঙ্গে তুলিত হইতেছে। তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সঙ্কীর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া ব্রহ্মনিষ্ঠার সঙ্গে তুলনা প্রাপ্ত হইল। ইহাতে কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে কি না?

সচরাচর এ প্রশ্নের এই উত্তর যে, কোন অর্থবিপর্য্যয় ঘটিতেছে না। কেন না, যাবান্ তাবান্ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে বসাইয়া লইতে হয়; তাহার উদাহরণ পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে। এ কথার এখানে দুইটি আপত্তি উপস্থিত হইতেছে।

প্রথম আপত্তি এই। মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্ কাটিয়া তাবান্ করিতে, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিতে পারেন কি? আমি যদি বলি, আমি যাবৎ না আসি, তুমি এখানে থাকিও, তাহা হইলে ব্যাখ্যাকার তাবৎ শব্দ বসাইয়া লইয়া 'তাবৎ তুমি এখানে থাকিও' বলিতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি যাবৎ কাটিয়া তাবৎ করেন, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ করেন, যদি বলেন যে, এই বাক্যের অর্থ 'আমি তাবৎ না আসি যাবৎ তুমি এখানে থাকিও' তাহা হইলে তাঁহার ব্যাখ্যা অগ্রাহ্য ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে।

আরও একটা উদাহরণের দ্বারা কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক।

"যাবৎ তোমার জীবন, তাবৎ আমার সুখ।" (ক)

এই বাক্যটি উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ন দাও। তার পর, উহার যাবৎ কাটিয়া তাবৎ কর, তাবৎ কাটিয়া যাবৎ কর। তাহা হইলে বাক্য এইরূপ দাঁড়াইতেছে।

"তাবৎ তোমার জীবন, যাবৎ আমার সুখ।" (খ)

এখন দেখ বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্য্যয় ঘটিল। (ক)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ যে, "তুমি যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব না।" (খ)-চিহ্নিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ "যত দিন আমি সুখী থাকিব, তত দিনই তুমি বাঁচিবে, তার পর আর তুমি বাঁচিবে না।" অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিল।

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্ কাটিয়া তাবান্, তাবান্ কাটিয়া যাবান্ করিবার অধিকারী নহেন। কিন্তু এখানে টীকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুঝিবার জন্য শ্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ্ন দেওয়া যাক্। তাহা হইলে শ্লোকস্থ "যাবানের" গায়ে (ক) এবং "তাবানের" গায়ে (গ) চিহ্ন পড়িতেছে।

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে

(গ) তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু

(ঘ) ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

তদ্ব্যাখ্যায় টীকাকার করিয়াছেন—

(ক) যাবানর্থ উদপানে

(খ) তাবান্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে

(গ) যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু

(ঘ) তাবান্ ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয়া দেখিবেন তাবান্ কাটিয়া যাবান্ হইয়াছে কি না। *

দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার যাবান্ তাবান্ বসাইয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু নিষ্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন কি? যেখানে নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইয়া লইয়া সোজা অর্থ করিলেই অর্থ হয়, সেখানেও কি যাবান্ তাবান্ বসাইয়া লইতে হইবে? এখানে কি নূতন যাবান্ তাবান্ না বসাইলে অর্থ হয় না? হয় বৈ কি। বড় সোজা অর্থই আছে।

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥

ইহার সোজা অর্থ আমি এইরূপ বুঝি ;—

সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতো ব্রাহ্মণস্য সর্ব্বেষু বেদেষু তাবানর্থঃ।

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন।

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন ঋষিতুল্য ভাষ্যকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না। আমার বোধ হয় যে, তাঁহারা এই অর্থের

---

* সত্য বটে, শঙ্করাচার্য্য তাবান্ শব্দের স্থানে যাবান্ শব্দ ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে "বৎ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কাজেই এক কথা।

প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি করিয়াছেন এবং অতিশয় দূরদর্শী দেশকালপাত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ করিয়াছেন। দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য কি? সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জলাশয়ে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে? কোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত—সকল ঠাঁইই জল পাওয়া যায়। ঘরে বসিয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কূপাদিতে যায় না। তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এখন, বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজের শিষ্য, আমরা না হয় সাহস করিয়া বলিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী এমন কথা কি বলিতে পারিতেন? বেদ স্বয়ম্ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ব্বফলপ্রদ। প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বর স্বরূপ খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন। কপিল ঈশ্বর পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু বেদ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি যাঁহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দু-সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন। অতএব শঙ্করাচার্য্য কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন সম্ভবে না যে, ব্রহ্মজ্ঞানীই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিষ্প্রয়োজনীয়। কাজেই তাঁহাদিগকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্রহ্মজ্ঞানেও যা বেদেও তা, একই ফল। তাহা হইলে বেদের মর্য্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে ব্যাখ্যা লিখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রহ্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান অতি তুচ্ছ। এক্ষণে সেই "সর্ব্বেষু বেদেষু" অর্থে "বেদোক্তেষু কর্ম্মসু" "বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে।" ইত্যাদি বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টীকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন।

এক্ষণে পাঠকের বিচার্য্য এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে হয় না, যেমন আছে তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন্য কিছু নূতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। কিন্তু সমস্ত টীকাকার, ভাষ্যকার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে। কোন্ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত? আমার কোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেমন বুঝিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম। দুই দিক্ই বুঝাইলাম, পাঠকের যে ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন। অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য আরও কিছু বলা যাইতে

পারে, কিন্তু ততটা প্রয়াস পাইবার বিষয় কিছু দেখা যায় না। বৈদিক ধর্ম্মের সঙ্গে গীতোক্ত ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বুঝিলেই হইল। সে সম্বন্ধ কি, পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি।

তৃতীয়; ইংরাজি অনুবাদকেরা এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ এরূপ না বুঝিয়া তাঁহারা বুঝেন, সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ "সংপ্লুতোদকে" পদ "উদপানের" বিশেষণ মাত্র। অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক বা না হউক, কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা হইতে পারে। তিনি এই শ্লোকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—

"To the instructed Brahmana there is in all the Vedas as much utility as in a reservoir of water into which waters flow from all sides."

দুঃখের বিষয় কেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাৎপর্য্য নাই। অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি এই শ্লোকের একটি টীকা লিখিয়া তাহাতে বলিয়াছেন—

"The meaning here is not easily apprehended. I suggest the following explanation :—Having said that the Vedas are concerned with actions for special benefits, Krishna compares them to a reservoir which provides water for various special purposes drinking, bathing &c. The Vedas similarly prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven, or destroying an enemy, &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরেজি অনুবাদকের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজনীয় হইতে পারে না। ইহাই বলা যথেষ্ট যে, Davis ও Thomson প্রভৃতি সাহেবেরা তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন। তবে তাঁহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু টীকা সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে। Thomson-কৃত টীকাটুকু পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

"As a tank full of fresh water may be used for drinking, bathing, washing one's clothes, and numerous other purposes, so the text of the Vedas may be turned to any object of self-interest by a Brahman who is well acquainted with them and knows how to wield them. We may exemplify this general fact by the uses made of texts from our scriptures in the mouths of the Puritans on the one hand, and of the Cavaliers on the other. Our author must not, however, be understood to reject the use of the Vedas by what he here says. He merely advises a careful use of them. Kapila himself admits them as a last source of proof of the truth when others fail."

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গীতার মর্ম্মার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। তবে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়াই স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি বুঝাইতে পারি বা না পারি, প্রাচীন ভাষ্যকারদিগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে পারিবেন, এমত ভরসা আছে। কিন্তু তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন করি যে, ইংরেজের কাছে যেন গীতার্থ বুঝিবার জন্য না যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বলিয়াই এ কথা বলিতেছি; এবং সেই প্রবৃত্তির বিনাশের জন্যই এতটা ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

প্রবাদ আছে যে, পুরাণাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন করিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সমুদ্রের বৃহৎ বৃহৎ উর্ম্মি-মালার মত তাঁহারও মানস-সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন, বলেন,—প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধ্য বেদোক্ত ধর্ম্মকে সহজ করিয়া প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে। তথাপি এখন আমার মনে হইতেছে, বুঝি আমার কর্ত্তব্য কিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি কি করিব নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে—অশান্ত মনে সমুদ্রতীরে আসিয়াছি—দেব। কোথায় আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার কি কর্ত্তব্য বাকি আছে, নির্দ্দেশ করিয়া আমার এই অশান্ত মনে শান্তি প্রদান করুন। "ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন ভক্তি জগতে প্রচার কর" এই উপদেশ দিয়া দেবর্ষি অন্তর্হিত হইলেন। কথিত আছে যে, ব্যাসদেব তখন ভাগবত ও ভগবদ্গীতা প্রণয়ন করেন, আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন করেন। এই কারণে কেহ কেহ মহাভারত গীতার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, অনুমান করেন।

গীতা ও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ। ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভক্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্য, পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

কি কথাটা হইতেছিল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভগবান্ অর্জ্জুনকে জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যে বলিলেন যে, এখন তোমাকে কর্ম্মযোগ শুনাইব। তখন কর্ম্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা

সাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃত্ত হইলেন। সে ভ্রান্তি এই যে, বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবিষ্ট, তাদৃশ লোক ঈশ্বরে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। তাই ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন যে, বেদ সকল "ত্রৈগুণ্যবিষয়" তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য হও বা বেদবিষয়কে অতিক্রম কর। কেন না, যেমন সর্ব্বত্র জলপ্লাবিত হইলে ব্যাপী কূপ তড়াগাদিতে কাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদে আর তাহার প্রয়োজন হয় না। কর্ম্মযোগের সহিত বৈদিক কর্ম্মের সম্বন্ধরাহিত্য এইরূপে প্রতিপাদন করিয়া ভগবান্ এক্ষণে কর্ম্মযোগ কহিতেছেন ;—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

কর্ম্মে তোমার অধিকার, কিন্তু ফলে কদাচ (অধিকার) না হউক। তুমি কর্ম্মফল-হেতু হইও না ; অকর্ম্মে তোমার আসক্তি না হউক। ৪৭।

এই শ্লোক বুঝিতে গেলে, "কর্ম্ম" কি, "কর্ম্মফলহেতু" কি, "অকর্ম্ম" কি বুঝা চাই।

"কর্ম্ম কি" কি, বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল। কর্ম্মফল যাহার প্রবৃত্তি হেতু, সেই "কর্ম্মফলহেতু"। কর্ম্মশূন্যতাই, অকর্ম্ম। কর্ম্ম কি, তাহা পরে বলিতেছি।

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম্ম করিও, কিন্তু কর্ম্মফল কামনা করিও না। কর্ম্মফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু না হয়। কিন্তু কর্ম্মের ফলের প্রত্যাশা না থাকিলে কেহ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও নিষিদ্ধ হইতেছে। বলা হইতেছে, ফল চাহি না, বলিয়া কর্ম্মে বিরত হইও না। অর্থাৎ কর্ম্ম অবশ্য করিবে, কিন্তু ফল কামনা করিয়া কর্ম্ম করিবে না।

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোকের অর্থ বুঝা গিয়াছে। ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম কর্ম্মতত্ত্ব। এরূপ উন্নত, পবিত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গলকর মহামহিমময় ধর্ম্মোক্তি জগতে আর কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবৎপ্রসাদাৎই হিন্দু এরূপ পবিত্র ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছে।

কিন্তু লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই। তাহার কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধিবিভ্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। আমরা আজিও ভাল করিয়া ইহা বুঝিতে পারি নাই।

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পূর্ণ-রূপে বুঝাইতে পারিব। ভগবান্ যাঁহাকে তাদৃশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে পারিবেন। তবে যতটুকু পারি, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষতি নাই।

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম্ম শব্দের অর্থ সম্বন্ধে। যাহা করা যায় বা করিতে হয়, তাহাই কর্ম্ম, কর্ম্ম শব্দের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্তু কতকগুলি হিন্দু শাস্ত্রকার বা হিন্দু-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের কৃপায় এ সকল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি। কর্ম্মমাত্রই কর্ম্ম নহে—বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ম্ম।

যদি তাই হয়, তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি করিবে, কিন্তু সেই সকল যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই স্বর্গাদির কামনা করিবে না।

এইরূপ অর্থ চিরপ্রচলিত বলিয়া সুশিক্ষিত ইংরেজিনবিশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন। সুপণ্ডিত কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ ইহার পূর্ব্ব-শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন, "The Vedas....prescribe particular rites and ceremonies for going to heaven or destroying an enemy &c. But, says Krishna, man's duty is merely to perform the actions prescribed for him among these, and not entertain desires for the special benefits named."

যদি কর্ম্ম শব্দের এই অর্থ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পড়িতে হইবে। পাঠক বলিবেন যে, যে কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, অন্য কোন প্রয়োজন নাই, যদি সে ফলই কামনা না করিলাম, তবে সে কর্ম্মই করিব কেন? নিষ্কাম কাম্যকর্ম্ম কিরূপ? কাম্যকর্ম্ম নিষ্কাম হইয়াই বা করি কেন?

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অর্থে বেদোক্তাদি কাম্যকর্ম্ম বুঝিলে আমরা কোন বোধগম্য তত্ত্বে উপস্থিত হইতে পারি না। আর বেদোক্ত কাম্যকর্ম্ম গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মের উদ্দিষ্ট নহে, তাহা গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ঐ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই "কর্ম্মযোগ"। ইহাতে কর্ম্ম সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

> ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

"কেহ কখন ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, কেন না, প্রকৃতিজ বা স্বাভাবিক গুণে সকলকেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য করে।"

এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যজ্ঞাদি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। কেবল সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলি—যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরেজিতে action বলে, তাহা সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বলা যাইতে পারে। কেহ কখন কাজ না করিয়া থাকিতে পারে

না, অন্য কোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (Nature) বশীভূত হইয়া কতকগুলি কাজ অবশ্য করিতে হইবে। যথা, অশন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্বাস ইত্যাদি। অতএব স্পষ্টই কর্ম্ম শব্দে বাচ্য, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহাই; যজ্ঞাদি নহে।

পুনশ্চ ঐ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কথিত হইতেছে

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥

"তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর; কর্ম্ম অকর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ; অকর্ম্মে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।"

এখানেও, নিশ্চিত কর্ম্ম শব্দ, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম বা "কাজ";—যজ্ঞাদি নহে। যজ্ঞাদি ব্যতীত সকলেরই শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে ও হইয়া থাকে, কেবল কাজ বা action, যাহাকে সচরাচর কর্ম্ম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না।

এবংবিধ প্রমাণ গীতা হইতে আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।* প্রমাণ নির্দ্দোষ হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট। অতএব আর নিষ্প্রয়োজনীয়।

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যায় কর্ম্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে কর্ম্ম বলা যায়, অর্থাৎ কাজ বা action, তাহাই ভগবানের অভিপ্রেত;—বৈদিক যজ্ঞাদি নহে।

তাহা হইলে, এই ৪৭ শ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করিতে হইবে। কিন্তু তাহার ফল কামনা করিবে না, নিষ্কাম হইয়া করিবে। এক্ষণে এই মহাবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে—প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে। দ্বিতীয়, সকল কর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া করিতে হইবে। এক একটি করিয়া বুঝা যাউক। প্রথম, কর্ম্ম করিতে হইবে।

কর্ম্ম করিতে হইবে কেন? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দুই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে। কর্ম্ম আমাদের জীবনের নিয়ম—Law of Life—কর্ম্ম না

---

* পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, "ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ" ইতি বাক্যও আছে। তাহার প্রচলিত অর্থ যজ্ঞ পক্ষে বটে। কিন্তু সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, বোধ করি পাঠক তাহা পশ্চাৎ বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব, এমন কথা বলি না—পাঠক সহজেই বুঝিবেন। এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, কখন কখন গীতাতেও কর্ম্ম শব্দে বৈদিক কাম্যকর্ম্ম বুঝায়, যথা, এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম"। কিন্তু এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ "কর্ম্মের" সঙ্গে কর্ম্মযোগের বিরুদ্ধভাব। গীতায় অনেকগুলি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না—সকলেই প্রকৃতিজগুণে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। কর্ম্ম না করিলে শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। কাজেই সকলকে কর্ম্ম করিতে হইবে।

কিন্তু সকল কর্ম্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কর্ম্মকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি। অসৎকর্ম্মও করিতে হইবে?

অসৎকর্ম্ম আমাদের জীবন নির্ব্বাহের নিয়ম নহে—ইহা আমাদের Law of Life নহে। অসৎকর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল থাকিতে পারে না, এমন নহে;—অসৎকর্ম্ম না করিলে কাহারও শরীরযাত্রা নির্ব্বাহের বিঘ্ন হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ যে বাঁচিতে পারে না, এমন নহে। সুতরাং অসৎ কর্ম্ম করিতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ঐ দুই শ্লোক হইতে উহা বুঝা যাইতেছে, পশ্চাৎ আরও বুঝা যাইবে।

পক্ষান্তরে, ইহাও জিজ্ঞাসিত হইতে পারে যে, যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই কি আমাদের জীবনযাত্রার নিয়ম? আমরা কতকগুলিকে সৎকর্ম্ম বলি, যথা পরোপকারাদি;—আর কতকগুলিকে অসৎকর্ম্ম বলি, যথা পরদারগমনাদি;—আর কতকগুলিকে সদসৎ কিছুই বলি না, যথা শয়ন ভোজনাদি। ভাল, বুঝা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিবার প্রয়োজন নাই; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মগুলি না করিলে নয়, সুতরাং করিতে হইবে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মগুলি করিব কেন? সৎকর্ম্ম মনুষ্যজীবনের নিয়ম কিসে?

এ কথার উত্তর আমার প্রণীত ধর্ম্মতত্ত্ব নামক গ্রন্থে সবিস্তারে দিয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আমি সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাকে আমরা সৎকর্ম্ম বলি, তাহাই মনুষ্যত্বের প্রধান উপাদান। অতএব ইহা মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহের নিয়ম।

বস্তুতঃ, কর্ম্মের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সৎকর্ম্ম বলি, আর যাহাকে সদসৎ কিছুই বলি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে প্রয়োজনীয়। এই জন্য এই দুইকে আমি ধর্ম্মতত্ত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়াছি। এই টীকাতেও বলিতে থাকিব।

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহার মীমাংসা কে করিবে? মীমাংসার স্থূল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়াছে, পশ্চাৎ দেখিব; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া আমি উক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব গ্রন্থে এ তত্ত্ব কিছু দূর মীমাংসা করিয়াছি।

এই শ্লোকোক্ত প্রথম বিধি, "কর্ম্ম করিবে," তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বলিয়া দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব। দ্বিতীয় বিধি এই যে, যে কর্ম্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম হইয়া করিবে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। অনেকে পরোপকার এইরূপ অভিপ্রায়ে করিয়া থাকে যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যুপকার করিবে। ইহা সকাম কর্ম্ম। ইহা এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার করে যে, ইহাতে আমার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া তৎফলে স্বর্গাদি লাভ হইবে। ইহাও সকাম কর্ম্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপকার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার উপর প্রসন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল করিবেন। তাহা হইতে পারে; ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই, এবং পরোপকারীর মঙ্গলও করিতে পারেন; কিন্তু ইহা নিষ্কাম কর্ম্ম নহে। ইহা সকাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত।

নিষ্কামকর্ম্মী তাহাও চাহে না, কিছুই চাহে না, কেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতে চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম—এই জন্য আমি করিব, কোন ফলই চাই না। ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব।

ধর্ম্মতত্ত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে। অতএব পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

নিষ্কাম কর্ম্ম সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা। এ তত্ত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ হইবে।

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

হে ধনঞ্জয়! যোগস্থ হইয়া "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম কর। সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিয়া (কর্ম্ম কর)। (এইরূপ) সমত্বকে যোগ বলে। ৪৮।

পূর্ব্বশ্লোকে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য যে কর্ম্ম, তাহাই বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে সেইরূপ কর্ম্ম করার পক্ষে, তিনটি বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে—

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে।

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে।

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিকে তুল্যজ্ঞান করিবে।

ক্রমশঃ এই তিনটি বিধি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

প্রথম, যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম করিবে। যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পাঠককে বুঝাইতে হইবে না যে, যাহাকে পতঞ্জলি ঠাকুর "চিত্তবৃত্তিনিরোধ" বলিয়াছেন, সেরূপ যোগের কথা হইতেছে না।

এখানে "যোগ" শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামীর মতে "পরমেশ্বরৈকপরতা।" শঙ্করাচার্য্যও তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থম্।" কিন্তু শ্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, "কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে।"

স্থূল কথা, যোগ কি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন অর্থ খুঁজিবার প্রয়োজন কি? সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে যে সমত্বজ্ঞান, তাহাই যোগ। তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব। তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র। সম্প্রসারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না।

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাক। "সঙ্গ" ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, "কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশঃ।" আমি কর্ত্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল ঈশ্বরাশ্রয়ে, অর্থাৎ ঈশ্বরই কর্ত্তা, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিবে।

শঙ্কর বলেন, "যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি, কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা," কেবল ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম করিবে, কিন্তু ঈশ্বর তজ্জন্য আমার শুভ করুন, এরূপ কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবে। ফলে, ফলকামনা ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ অর্থে "সঙ্গ" শব্দ পুনঃপুনঃ গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখা যায়।

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কর্ম্মসিদ্ধি, এবং কর্ম্মের অসিদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ বুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞানীদিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাঁহার মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তিই কর্ম্মের সিদ্ধি। তাই তিনি বলেন যে, "সত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ।" এবং "তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিঃ।" শ্রীধর ঠাকুরও এখানে শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি বলেন, "কর্ম্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ" ইত্যাদি।

এখন জ্ঞান, কর্ম্মের ফল কি না, সে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। আপাততঃ, যে কথাটা উপস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝিতে পারিলে আমাদিগের পরমলাভ হইবে। টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী সেই সোজা অর্থ বুঝাইয়াছেন। তিনি বলেন, "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বেতি ফলসিদ্ধৌ হর্ষং ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা"

ইত্যাদি। ফলাসিদ্ধিতে হর্ষত্যাগ এবং ফলের অসিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, ইহাই সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমত্বজ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ হইবে। যে নিষ্কাম, ফলকামনা করে না, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং অসিদ্ধিতে বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলসিদ্ধিতে আনন্দ লাভ করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে ফলকামনা করে—কেন না, ফলকামনা না করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলাভ করিবে কেন। কর্ম্মকারী নিষ্কাম হইলে, তাহার ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা অসিদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে অসিদ্ধি ও সিদ্ধি সমান। এই সমত্বজ্ঞানই যোগ। তাদৃশ যোগস্থ হইয়া কর্ম্ম কর, ইহাই প্রথম বিধি।

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট। বুদ্ধিতে আশ্রয় প্রার্থনা কর। যাহারা সকাম, তাহারা নিকৃষ্ট। ৪৯।

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হয় নাই। শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-যুক্ত কর্ম্মযোগই বুদ্ধিযোগ। শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে। তাহা হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইবে, এখানে কর্ম্ম শব্দে কাম্যকর্ম্ম। ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন। অতএব শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের অর্থ এই যে, যে কর্ম্মযোগের কথা বলিলাম, তাহা হইতে কাম্যকর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট।

শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ কর, বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান কর। ইহাতে এখানে "বুদ্ধি" শব্দে ঐ বুদ্ধিযোগই বুঝিতে হয়। ভাষ্যকারেরা বলেন, সাংখ্য-বুদ্ধি বা জ্ঞান। যদি তাই হয়, তবে প্রথমার্দ্ধেও বুদ্ধি শব্দে জ্ঞান বুঝাই উচিত। তাহা হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্ভে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন" ইত্যাদি বাক্যে আর কোন গোলযোগ হইবে না। কিন্তু পরবর্ত্তী ৫০ শ্লোকে কিছু গোলযোগ বাধিবে।

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০ ॥

যিনি বুদ্ধিযুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তজ্জন্য তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। ৫০।

"বুদ্ধিযুক্ত"—অর্থাৎ বুদ্ধিযোগে যুক্ত। যে সকল কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, তাহাই সুকৃত; আর যে সকল কর্ম্মের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে স্বর্গাদি

বা নরকাদি প্রাপ্তি হয়, তাদৃশ উভয়বিধ কর্ম্মই পরিত্যাগ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এমন নহে যে, তিনি কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করেন না, অথবা ভাল মন্দ কোন কর্ম্মই করেন না। ইহার অর্থ এই যে, তিনি স্বর্গাদি কামনা বা নরকাদির ভয়ে কোন কর্ম্ম করেন না। যাহা করেন, তাহা অনুষ্ঠেয় বলিয়া করেন।

অতএব তুমি যোগের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মে কৌশলই যোগ। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম্ম বন্ধনজনক, কেন না, কর্ম্ম করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তাদৃশ বন্ধনকেও যদি ঈশ্বরারাধনার সাহায্যে মুক্তির উপায়ে পরিণত করিতে পারা যায়, তবে তাহাকেই কর্ম্মের কৌশল বা চাতুর্য্য বলা যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমরা এরূপ বুঝিতে প্রস্তুত নহি। আমরা বুঝি, যিনি কর্ম্মে কুশলী, অর্থাৎ আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল যথাবিহিত নির্ব্বাহ করেন, তিনিই যোগী। কর্ম্মে তাদৃশ কৌশল বা বিহিত অনুষ্ঠানই যোগ। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্।" এ কথার এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে, ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই অনুবর্ত্তী হইব।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময়-পদপ্রাপ্ত হয়েন। ৫১।

"বুদ্ধিযুক্ত"—বুদ্ধিযোগাবলম্বী।

অনাময়পদ—সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বিষ্ণুপদ। (শ্রীধর)

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥

যবে তোমার বুদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করিবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় সকলে বৈরাগ্যপ্রাপ্ত হইবে। ৫২।

এই ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাময়পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন, মোহ বা দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমস্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগ্য বা

কামনাশূন্যতা জন্মে। স্বর্গাদি সুখ বা রাজ্যাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইতে হয় না।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

তোমার "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" বুদ্ধি যখন সমাধিতে নিশ্চলা (সুতরাং) অচলা হইয়া থাকিবে, তখন যোগপ্রাপ্ত হইবে। ৫৩।

"শ্রুতিবিপ্রতিপন্না"। বিপ্রতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত।* কিন্তু শ্রুতি কি? শ্রুতি, যাহা শুনা গিয়াছে—আর শ্রুতি, বেদকে বলে। বেদ বুদ্ধিবিক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা প্রাচীন ভাষ্যকারেরা স্বীকার করিতে পারেন না; সুতরাং এখানে শ্রুতি শব্দে "যাহা শুনা গিয়াছে," তাঁহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজা—শ্রুতি, শ্রবণ মাত্র। মধুসূদন আর একটু বেশী বলেন, "নানাবিধ ফলশ্রবণই" শ্রুতি। শঙ্করাচার্য্য তাই বলেন, তবে তাঁহার মার্জ্জিত লেখনীর শব্দের ছটাটা বেশীর ভাগ। তিনি বলেন, "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।" শ্রীধর স্বামী সকলের অপেক্ষা একটু সাহস করিয়াছেন—তিনি বলেন, "নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না।"

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না—বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অনেক সময়ে পণ্ডিত মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করেন না। Davis সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন—

"I, too, have consulted Hindu Commentators largel (কদাচিৎ) and have found them deficient in critical insight and more intent on finding or forming Vedantist doctrines in every part than in giving the true sense of the author. (শাঙ্কর ভাষ্য সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকেও এ কথা বলিয়া থাকেন)। I have examined their explanations with the freedom of inquiry that is common to western habits of thought, and thus while I have sometimes followed their guidance, I have been obliged to reject their comments as misrepresenting the doctrine of the author. I append some instances of this kind, that my readers may be able to form their own judgement."

এই বলিয়া, সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি শ্রুতি শব্দে 'বেদ' এই অর্থ করেন। এবং উপরিলিখিত উক্তির পোষকতায় বলেন যে—

---

* *Anglice*—distracted.

"Here the reference is to *Sruti* which means (1) hearing, (2) revelation. Hindu commentators say that the meaning is, what you have heard, about the means of obtaining desirable things ; assuming as a certain proposition that the Vedas could not be attacked. The doctrine of the Bhagavadgita is, however, that the devotee (*yogin*), when fixed in meditation lays aside the Vedas and Vedic ritual."

ডেবিস এক জন ক্ষুদ্রপ্রাণী—তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া কাগজ নষ্ট করিবার প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের—খোদ লাসেনের। তিনিও "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" পদের ঐরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। আর আর ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাঁহার পথে গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ডেবিসের আত্মশ্লাঘার ভিতর একটি অমূল্য কথা আছে—সেই অমূল্য তত্ত্ব ভারতবর্ষে ইদানীং ছিল না ও এখনও নাই। "FREEDOM OF ENQUIRY"—এই অমূল্য বাক্যের অনুরোধেই আমরা তাঁহার ন্যায় লেখকের আত্মশ্লাঘা উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হইলাম না।

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুঝাইয়াছি, তাহার সঙ্গে দেশী মতের অপেক্ষা বিলাতী মতটা বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছা করিলে শ্রীধর স্বামীকে এখানে বিলাতী দলে টানিয়া লইতে পারেন।

এই শ্লোকে "শ্রুতিবিপ্রতিপন্না" ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বুঝাইবার প্রয়োজন। যাহাতে চিত্ত সমাহিত হয়, তাহাই "সমাধি"।

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করিলে, পাঠক বোধ হয় শ্লোকার্থ বুঝিতে পারিবেন।

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪ ॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—

হে কেশব! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার কি লক্ষণ? স্থিতধী ব্যক্তি কি বলেন, কিরূপে অবস্থান করেন, কিরূপ চলেন? । ৫৪ ।

ইতিপূর্ব্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্ এক্ষণে অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ বুঝাইলেন। কর্ম্মযোগের শেষ কথা এই বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফল সম্বন্ধে যাহা (বেদেই হউক, অন্যত্রই হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যত দিন সেরূপ থাকিবে, তত দিন তুমি কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। কিন্তু যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে (পরমেশ্বরে)

স্থির হইবে, তখন তুমি যোগপ্রাপ্ত হইবে। যাহার এইরূপ বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অর্জ্জুন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

যখন সকল প্রকার মনোগত কামনা বর্জ্জিত হয়, আপনাতে বা (আত্মাতে) আপনি তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫।

কামনার পূরণেই মানুষের সুখ দেখিতে পাই। যে কামনা ত্যাগ করিল, তাহার আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচার্য্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অন্য আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। বেদে তাদৃশ ব্যক্তিকে "আত্মারাম" বলা হইয়াছে।

আমরা আর একটা সোজা উত্তরে সন্তুষ্ট। আমরা স্বীকার করি, পরমেশ্বরই আনন্দ। তিনিই পরমানন্দ। কিন্তু বহির্জগৎও ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে। কামনাশূন্য হইলে বহির্ব্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না কেন? যে কামনাশূন্য, সে কি জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানার্জ্জনে আনন্দলাভ করে না? না সৎকর্ম্ম-সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ম্মের অনুষ্ঠানই আনন্দময়—তাহার উপর সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্যজ্ঞান থাকিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ আনন্দ আত্মাতেই; কাহারও সাপেক্ষ নহে।

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বুঝিবেন, তিনি গীতার এই সকল উক্তি, এই শ্লোক, এবং ইহার পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোক Ascetic Philosophy বলিয়া গণ্য করিবেন। বস্তুতঃ ইহা Asceticism নহে। সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নির্ব্বিঘ্ন উপভোগের এই তত্ত্বই উপযোগী। সংসারে উপভোগ্য যে কিছু সুখ আছে, তাহার উপভোগের বিঘ্ন কামনা ও ইন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য। তাহা বশবর্ত্তী হইলে সাংসারিক সুখসকলের উপভোগের আর কোন বিঘ্ন থাকে না, সংসার পবিত্র ও সুখময় কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার জন্য মৎপ্রণীত অনুশীলনতত্ত্বে (ধর্ম্মতত্ত্ব, প্রথম ভাগ) আমি বিশেষ যত্ন পাইয়াছি, সুতরাং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্ত্তী শ্লোক সকলে ইহা বিশেষ প্রকারে পরিস্ফুট হইবে।

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

দুঃখে যিনি অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, যাঁহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর নাই, তাঁহাকে স্থিতধী মুনি বলা যায়। ৫৬।

এ সকল Asceticism নহে, এই তত্ত্ব দুঃখনাশক, (সুতরাং) সুখবৃদ্ধির উপায়। দুঃখে যে কাতর হয়, সেই দুঃখী। দুঃখে যাহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, সে দুঃখজয়ী হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ নাই। সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দুঃখী, কেন না, সুখের স্পৃহা অনেক সময়েই ফলবতী হয় না, ফলবতী হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় অবস্থাতেই সেই সুখস্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব সুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির কারণ। ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য। অনুরাগ অর্থে এখানে সকল প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে। যথা ঈশ্বরানুরাগ—ইহা কখন নিষিদ্ধ হইতে পারে না। অনুরাগ অর্থে, এখানে কেবল কাম্য বস্তুতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্তুতে অনুরাগই বুঝিতে হইবে। তাদৃশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের কারণ, তাহা আবার বলিতে হইবে না।

বলিতে কেবল বাকি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ করিলেই সুখত্যাগ করা হইল না। এবং সুখস্পৃহাত্যাগ ভিন্ন, সুখভোগত্যাগ এখানে বিহিত হইতেছে না। যে সুখে স্পৃহাশূন্য, সে সর্ব্বপ্রকার সুখভোগ করিতে পারে, এবং করিয়াও থাকে। স্বয়ং জগদীশ্বর সর্ব্বপ্রকার স্পৃহাশূন্য, অথচ অনন্তসুখে সুখী। তবে মনুষ্য সম্বন্ধে এই আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশূন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা করিবে না, সুখলাভের চেষ্টা না করিলে, মনুষ্য সুখলাভ করে না। যিনি কর্ম্মযোগ বুঝিয়াছেন, তিনি কখন এই আপত্তি করিবেন না। কর্ম্মযোগের মর্ম্ম এই যে, নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মের ফলই সুখ—যে অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সুনির্ব্বাহ করে, সে তজ্জনিত সুখলাভও করে। যে কামনা, বা স্পৃহার অধীন হইয়া কর্ম্ম করে, সে সুখ লাভ করে না—কামনা ও স্পৃহা অননুষ্ঠেয় কর্ম্মের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। অতএব নিষ্কাম ও সুখে স্পৃহাশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে—সুখ আপনি আসিবে। ৭০ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং তাহাই বলিয়াছেন, পরে দেখিব।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

যিনি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য, তত্তদ্বিষয়ে শুভপ্রাপ্তিতে আনন্দিত বা অশুভপ্রাপ্তিতে বিদ্বেষযুক্ত হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৫৭।

"সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য।"—শ্রীধর বলেন, সর্ব্বত্র কি না "পুত্রমিত্রাদিম্বপি।" শঙ্কর বলেন, "দেহজীবিতাদিম্বপি।" শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। দেহ জীবনাদির শুভাশুভে যাহার কোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরে স্থির হইবার সম্ভাবনা, তাহা বুঝাইতে হইবে না।

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

কূর্ম্ম যেমন সকল বস্তু হইতে আপনার অঙ্গ সকল সংহরণ করিয়া লয়, তেমনি যিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল সংহরণ করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ৫৮।

এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন কোন প্রকার ধর্ম্মাচরণ নাই, ইহা সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্ম্মমন্দিরের প্রথম সোপান।* সর্ব্বশাস্ত্রেই আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। কেবল এই কূর্ম্মের উপমার প্রতি একটু মনোযোগ আবশ্যক। কূর্ম্ম তাহার হস্তপদাদি সংহৃত করিয়া রাখে—ধ্বংস করে না, এবং আবশ্যকমতে তদ্দ্বারা জৈবনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই ধর্ম্ম, ধ্বংস ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি।

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

নিরাহার দেহীর (ইন্দ্রিয়াদির) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ যায় না। (কেবল) ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেই তাহা বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। ৫৯।

"নিরাহার"—যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত।

মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। উপভোগ যায়, কিন্তু বাসনা যায় না। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা আতুরাদির উদাহরণ দিয়াছেন। যে জড় বা আতুর, তাহার উপভোগের সাধ্য নাই, সুতরাং উপভোগ নাই। কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা শোচনীয় উদাহরণ আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। লোকনিন্দাভয়ে বা পবিত্র চরিত্রের ভান করিয়া বা সন্ন্যাসাদি ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত্যাগ করেন, কিন্তু বাসনা ত্যাগ করিতে

* All ethical gymnastic consists therefore singly in subjugating the instincts and appetites of our physical system in order that we remain their masters in any and all circumstances hazardous to morality : a gymnastic exercise rendering the will hardy and robust and which by the consciousness of regained freedom makes the heart glad. Kant : *Metaphysics of Ethics*—translated by Semple.

পারেন না। তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া পাপের স্রোতে সব ভাসিয়া যায়। ঈদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে উপভোগরত ব্যক্তির প্রভেদ বড় অল্প। এইরূপ মানসিক অবস্থা বড় দুর্জ্জয়। কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা দূরীকৃত হয়। "পরং দৃষ্ট্বা" এই কথার এমন তাৎপর্য্য নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে।

ধর্ম্মের এই বিঘ্ন এমন গুরুতর যে, ভগবান্ পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পরিস্ফুট করিতেছেন।

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

হে কৌন্তেয়! বিবেকী পুরুষ প্রযত্ন করিলেও প্রমথনকারী ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক চিত্ত হরণ করে। ৬০।

সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, যোগযুক্ত হইয়া, মৎপর হইয়া, যিনি অবস্থান করেন, যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত হইয়াছে, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬১।

এই গেল ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা। যিনি বিবেকী, তিনিও যত্ন করিয়াও ইহাদিগের সহজে দমন করিতে পারেন না, বলপূর্ব্বক ইহারা চিত্তকে হরণ করে। আর যাহারা যত্ন করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ করে না, কিন্তু মনে কেবল সেই ইন্দ্রিয়-বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ ঘটে। সেই কথা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বলা হইতেছে।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩ ॥

(ইন্দ্রিয়ের) বিষয় ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে কামনা জন্মে, কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে। ৬২।

ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ হইতে বিনাশ ঘটে। ৬৩।

যাহাকে মনে পুনঃপুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক্তি জন্মিবে। আসক্তি জন্মিলে তাহা পাইতে ইচ্ছা করে, অর্থাৎ কামনা জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক বিষয়ের প্রতি ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা জন্মে। এরূপ মোহ হইতে কার্য্য-কারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাশ হইল। বুদ্ধিনাশে বিনাশ।*

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্দ্রিয়াদির বিষয়কে মনেও স্থান দেওয়া হইবে না। তবে কি ইন্দ্রিয়াদির উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যদি তাহা হয়, তবে এই গীতোক্ত ধর্ম্ম asceticism† না ত কি? তাহা হইলে জনসমাজকে সন্ন্যাসীর মঠে পরিণত করিতে হয়।

তাহা নহে, ইন্দ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরশ্লোকে দেওয়া হইতেছে।

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

যিনি বিধেয়াত্মা, তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ লাভ করেন। ৬৪।

বিধেয়াত্মা—যাঁহার আত্মা বা অন্তঃকরণ বশবর্ত্তী।

ঈদৃশ ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সকল নিজের আজ্ঞাধীন—বলের দ্বারা তাঁহার চিত্ত হরণ করিতে পারে না। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকল ভোগ্যবিষয়ের প্রতি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত—ইন্দ্রিয় সকল তাঁহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়াদি বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি‡ লাভ করেন। অর্থাৎ তাঁহার কৃত উপভোগ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ। তাই বলিতেছিলাম যে, গীতোক্ত এই ধর্ম্ম Ascetic Philosophy নহে—প্রকৃত পুণ্যময় ও সুখময় ধর্ম্ম। বিষয়ের উপভোগ ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে।

একটা কথা বুঝাইতে বাকি আছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয় সকলকে "রাগদ্বেষ-বিমুক্ত"—অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বলা হইয়াছে। বিধেয়াত্মা পুরুষের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে

* সীতারামের চরিত্রে বর্ত্তমান লেখক এই কথাগুলিন উদাহরণের দ্বারা পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিয়াছেন।

† আমরা যাহাকে বৈরাগ্য বা সংন্যাস বলি, Asceticism তাহা হইতে একটু স্বতন্ত্র জিনিস। এই জন্য ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি।

‡ "Makes the heart glad,"—পূর্ব্বোদ্ধৃত কান্তের উক্তি দেখ।

অনুরাগশূন্য কেন হইবে, তাহা বুঝান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্বেষশূন্য বলিবার কারণ কি? ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগই ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, কখন দেখান যায় না। যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহার নিষেধের কারণ কি? আর যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই—তাহা হইলে আর ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃত্তি থাকিবে না। তবে এ নিষেধ কেন?

উপভোগ্যে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে। রোগীর আহারে অরুচি এবং অলসের ব্যায়ামসুখে অরুচি, উদাহরণ-স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে। এ সকল শারীরিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানসিক স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দেখিতে পাই, কিছুতেই পাড়ওয়ালা ধুতি পরিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন না। ইঁহাদিগের চিত্ত আজিও বিকারশূন্য হয় নাই, যে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পরিবে না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি। যখন সকলই সমান জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপত্তি করিবে না।

এই সকল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট কথা নহে। একটা বড় উদাহরণ দ্বারা ইহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি। রোমান কাথলিক ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের ইন্দ্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিদ্বেষ—কার্য্যতঃ না হউক, বিধিতঃ বটে। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে চিরকৌমার বিহিত ছিল। ইহার ফলে কিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসপাঠক মাত্রেই জানেন। কিন্তু আর্য্য ঋষিরা যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ—কোন ইন্দ্রিয়ের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। অতএব তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া, যথাকালে দারপরিগ্রহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেমন বিদ্বেষশূন্য, ইন্দ্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশূন্য, অতএব কেবল ধর্ম্মতঃ সন্তানোৎপাদন জন্যই বিবাহ করিতেন, এবং সেই জন্য স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট সাময়িক নিয়মের অতিরিক্ত কখন ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন না।

Asceticism দূরে থাকুক, যাহাকে Puritanism বলে, এই গীতোক্ত ধর্ম্ম তাহারও বিরোধী। কেন না, Puritanism এই "বিদ্বেষ"-বুদ্ধিজাত। গীতোক্ত ধর্ম্মে কোনরূপ ভণ্ডামি চলিবার পথ নাই।

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

প্রসাদে তাঁহার সকল দুঃখের বিনাশ জন্মে। যিনি প্রসন্নচিত্ত, আশু তাঁহার বুদ্ধি স্থিত হয়। ৬৫।

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবশ্য ও রাগদ্বেষবিমুক্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ের উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত, বা শান্তি। এক্ষণে কথিত হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়, এবং সেই প্রসন্নচেতার স্থিতপ্রজ্ঞতা জন্মে।

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬ ॥

অযুক্তের বুদ্ধি নাই। অযুক্তের ভাবনা নাই। যাহার ভাবনা নাই, তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ নাই। ৬৬।

অযুক্ত অসমাহিতান্তঃকরণ (যোগশূন্য)। ভাবনা ধ্যান, চিন্তা। যাহার অন্তঃকরণ অসমাহিত, ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্ত্রাদির আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে না। যাহার বুদ্ধি নাই, সে চিন্তা করিতে পারে না। (ভাষ্যকারেরা বলেন, আত্মজ্ঞানাভিনিবেশ নাই) যাহার চিন্তার শক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্তি না থাকিলে সুখ নাই।

ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহা বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। তবে সে বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী করে না, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে।

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

যাহার মন বিষয়ে প্রবর্ত্তমান ইন্দ্রিয়গণের অনুবর্ত্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে মগ্ন করে, সেইরূপ (ইন্দ্রিয়) তাহার প্রজ্ঞা হরণ করে। ৬৭।

টীকার প্রয়োজন নাই।

তস্মাদ্‌যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮ ॥

অতএব হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয় সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্ব প্রকারে বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ। ৬৮।

টীকার প্রয়োজন নাই।

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯ ॥

যাহা সর্ব্বভূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত। সর্ব্বভূত যখন জাগে, দৃষ্টিযুক্ত মুনির তাহাই রাত্রি। ৬৯।

মহাভারতকারের অনুবাদই এই শ্লোকের প্রচুর টীকা। "অজ্ঞানতিমিরাবৃতমতি ব্যক্তিদিগের নিশাস্বরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠাতে জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত থাকেন। এবং প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্বরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতত্ত্বদর্শী যোগীদিগের সেই রাত্রি।"

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥ ৭০॥

যেমন পূর্য্যমান স্থিরপ্রতিষ্ঠ সমুদ্রে নদী সকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগ সকল যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগ সকলের কামনা করেন, তিনি পান না। ৭০।

সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদী সকল আপনা হইতে জল লইয়া সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে। তেমনি যিনি ইন্দ্রিয় সকল বশ করিয়াছেন, ভোগ সকলি আপনা হইতেই তাঁহাকে আশ্রয় করে; সেই কারণে তিনিই শান্তি লাভ করেন। যিনি ইন্দ্রিয়তাড়িত, সুতরাং কামনাপরবশ, তিনি সে শান্তি কদাচ লাভ করিতে পারেন না। এখন ৫৬ শ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। কামনা পরিত্যাগই কর্ম্মফলজনিত সুখলাভের কারণ। কর্ম্মফলজনিত সুখ আসিয়া তাঁহাকে আপনি আশ্রয় করে। তাদৃশ সুখই শান্তিদায়ক। কামনাজনিত সুখে শান্তি নাই; সুতরাং সে সুখ সুখই নয়।

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১॥

যিনি সর্ব্বকামনা ত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশূন্য এবং নিরহঙ্কার, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭১।

মমতাশূন্য—আত্মাভিমানশূন্য।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাঽস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি॥ ৭২॥

হে পার্থ। ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। কেবল অন্তকালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ৭২।

তবে ব্রহ্মনিষ্ঠা, অতি অল্প কথার ভিতর আসিল। ইন্দ্রিয়সংযম এবং কামনা-পরিত্যাগই ব্রহ্মনিষ্ঠা। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহা লক্ষণ মাত্র—ভগবদারাধনা ভিন্ন কামনাত্যাগ ঘটে না। অতএব সংযতেন্দ্রিয় ও নিষ্কাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণপূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা।

ইহা হইলেই ধর্ম্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের সারভাগ। গীতায় আর যাহা কিছু আছে, তাহা এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র—অধিকারভেদে পদ্ধতিনির্ব্বাচন মাত্র। হিন্দুধর্ম্মে বা অপর কোন ধর্ম্মে ইহা ছাড়া যাহা কিছু আছে, তাহা ধর্ম্মের প্রয়োজনীয় অংশ নহে। তাহা হয় উপন্যাস, নয় উপধর্ম্ম, নয় সামাজিক নীতি, নয় বাজে কথা—ত্যাগ করিলেই ভাল। ইহা সকলের আয়ত্ত, ইহার জন্য বেদাধ্যয়নের আবশ্যক নাই, সন্ধ্যা-গায়ত্রীর আবশ্যক নাই। স্ত্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শূদ্র বা ম্লেচ্ছ, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ান, সকলেরই ইহা আয়ত্ত। ইহাই জগতে একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই একমাত্র Catholic religion.

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্ম-
বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-
সংবাদে সাংখ্যযোগো নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১ ॥

হে জনার্দ্দন! যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব! আমাকে হিংসাত্মক কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?। ১।

বুদ্ধি অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু দ্বিতীয়াধ্যায়ের শেষ কয়েক শ্লোকে, অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণে অর্জ্জু এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, যদি জ্ঞানই কর্ম্ম হইতে শ্রেষ্ঠ, তবে আমাকে কর্ম্মে, বিশেষ যুদ্ধের ন্যায় নিকৃষ্ট কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ ?

অর্জ্জুনের এইরূপ সংশয় কিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন "অশোচ্যানম্বশোচস্তম্" (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১১শ শ্লোক দেখ) ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রথমে মোক্ষসাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির কথা বলিয়া, তাহার পর "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোক দেখ) কর্ম্মও কথিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা বুদ্ধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নিষ্ক্রিয়ত্ব, নিয়তেন্দ্রিয়ত্ব, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুণবাদে "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (৭২ শ্লোক দেখ) সপ্রশংসা উপসংহারে, বুদ্ধি ও কর্ম্ম এতন্মধ্যে বুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্বই ভগবানের অভিপ্রায় বুঝিয়াই অর্জ্জুন এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ দ্বিতীয়াধ্যায়ে স্পষ্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। তবে ৪৯ শ্লোকে কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে,

"দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।"

এখানে ভাষ্যকারেরা যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্ম্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি। সেখানে এই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি অর্থে জ্ঞান বুঝিলে আর কোনও গোল থাকে না। নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপস্থিত হয়, এ কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আনন্দগিরিও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যের টীকায় "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" ইত্যাদি শ্লোকটি বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাহাই হউক, জ্ঞান কর্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে, তাহা কিছু "ব্যামিশ্র" (anglice ambiguous) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ব্বকই ভগবান্ কথা প্রথমে পরিস্ফুট করেন নাই—এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে জ্ঞান-কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা হইয়াছে, ইহা মনুষ্যের অনন্ত মঙ্গলকর, এবং ইহাকে অতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রসূত বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর কোথাও কখনও ভূমণ্ডলে এরূপ সর্ব্ব-মঙ্গলময় ধর্ম্ম কথিত হয় নাই।

অর্জ্জুন সেই "ব্যামিশ্র" বাক্যের কথাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ করিতেছ। অতএব যাহার দ্বারা আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই (এক প্রকার নিষ্ঠাই) আমাকে নিশ্চিত করিয়া বলিয়া দাও। ২।

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩ ॥

হে অনঘ। ইহলোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠা আছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। অর্থাৎ সাংখ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং (কর্ম্ম) যোগীদিগের কর্ম্মযোগ বলিয়াছি। ৩।

এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

এই কর্ম্মের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈষ্কর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয় না। আর, কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। ৪।

অর্জ্জুনের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্ম্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যদি শ্রেষ্ঠই হয়, তাহা হইলে কি তোমাকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলিতে হইবে? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম্মত্যাগ করিতে পারিবে? তুমি কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেই কি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইবে? না নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?

কর্ম্মের অননুষ্ঠানে কেন নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্ বলিতেছেন,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫ ॥

কেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। ৫।

হে অর্জ্জুন! তুমি বলিতেছ, জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও আমি তোমাকে কর্ম্ম করিতে বলিতেছি, কিন্তু কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পার কৈ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস,

প্রশ্বাস, অশন, শয়ন, স্নান, পান, এ সকল কর্ম্ম নয় কি ? জ্ঞানমার্গাবলম্বী হইলে এ সকল ত্যাগ করা যায় কি ?

জিজ্ঞাসু এখানে বলিতে পারেন যে, যে সকল কর্ম্ম প্রকৃতির বশ হইয়া করিতে হইবে, তাহা ত্যাগ করা যায় না বটে ; কিন্তু যে সকল কার্য্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা কি জ্ঞানী বা সন্ন্যাসী পরিত্যাগ করিতে পারেন না ?

ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম কেহই পরিত্যাগ করিতে পারে না। ঈশ্বর-চিন্তা স্বেচ্ছাধীন কর্ম্ম, ইহা কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ করিতে পারে ? তবে জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি ?

অনেকে বলিবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে, তাহার কথা হইতেছে না। হিন্দুশাস্ত্রে শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্মকেই কর্ম্ম বলে। কিন্তু ইহা সত্য নহে, শ্রৌত কর্ম্ম ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকাল তিষ্ঠিতে পারে না এবং এই সকল স্বাভাবিক নহে যে, প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা করিতে হয়। অতএব সাধারণতঃ যাহাকে কর্ম্ম বলে —যাহা কিছু করা যায়—তাহারই কথা হইতেছে বটে। ইহা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি। গীতার ব্যাখ্যায় কর্ম্ম বলিলে, কর্ম্মমাত্রেই বুঝিতে হইবে ; কেবল শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্ম যে ভগবানের অভিপ্রেত নহে, তাহা এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬॥

যে বিমূঢ়াত্মা, মনেতে ইন্দ্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, কেবল কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া অবস্থিতি করে, সে মিথ্যাচারী। ৬।

ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মের অনমুষ্ঠানেই নৈষ্কর্ম্ম্য পাওয়া যায় না এবং কর্ম্মত্যাগেই সিদ্ধি পাওয়া যায় না। কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে যে নৈষ্কর্ম্ম্য ঘটে না, ভগবান্ তাহার এই প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হইবে। আর কর্ম্মত্যাগেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন যে, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করিয়া, "কর্ম্ম করিব না" বলিয়া বসিয়া থাকিলেও, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় সকল মনে আসিয়া উদিত হইতে পারে। তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র। তাহাতে কোন সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই।

যদি কর্ম্মত্যাগও করা যায় না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে কর্ত্তব্য কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হে অর্জ্জুন! যে ইন্দ্রিয় সকল মনের দ্বারা নিয়ত করিয়া অসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ। ৭।

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

তুমি নিয়ত কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মশূন্যতা হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মশূন্যতায় তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ৮।

"তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব!" অর্জ্জুনের এই প্রশ্নের, ভগবান্ এই উত্তর দিলেন। উত্তর এই যে, কর্ম্মত্যাগ কেহই করিতে পারে না, এবং কর্ম্মত্যাগ করিলেই সিদ্ধি ঘটে না। কর্ম্ম না করিলে তোমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সম্ভাবনা নাই। অতএব কর্ম্ম করিবে। তবে যদি কর্ম্ম করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে কর্ম্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই করিবে। কর্ম্ম যাহাতে শ্রেয়ঃসাধক হয়, তাহার দুইটি নিয়ম কথিত হইল। প্রথম, ইন্দ্রিয় সকল* মনের দ্বারা সংযত করিয়া, দ্বিতীয়, অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। তদতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে। তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মযোগের কেন্দ্রীভূত। তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

যজ্ঞার্থ যে কর্ম্ম, তদ্ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম ইহলোকে বন্ধনের কারণ। হে কৌন্তেয়! তুমি সেই জন্য (যজ্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর। ৯।

যজ্ঞ শব্দের অর্থের উপর এই শ্লোকের ব্যাখ্যা নির্ভর করে। সচরাচর, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপকে পূর্ব্বে যজ্ঞ বলিত,—যথা অশ্বমেধাদি। এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে।

প্রাচীন ভাষ্যকার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থে গ্রহণ করেন না। শঙ্কর বলেন,—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ"। শ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন। মধুসূদন সরস্বতীও এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বলেন না। তিনি দ্রব্যাজনাদিক কর্ম্মকে যজ্ঞ বলেন।

* ভাষ্যকারেরা বলেন,—কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল।

শঙ্করাদি কথিত যজ্ঞ শব্দের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ হয় যে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ভিন্ন যে সকল কর্ম্ম, তাহা কেবল কর্ম্মফল ভোগের জন্য বন্ধন মাত্র। অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদ্দেশেই কর্ম্ম করিবে।

তাহা হইলে, বিচার্য্য শ্লোকের অর্থ এই হয় যে, ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহা ভিন্ন অন্য সকল কর্ম্ম, কর্ম্মফলভোগের বন্ধন মাত্র। অতএব কেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম্ম করিবে।

এস্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, তাও কি হয়? ভগবান্‌ই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত পক্ষে প্রকৃতিতাড়িত হইয়া এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থও কর্ম্ম করিতে হইবে। ঈশ্বরারাধনা কি সে সকল কর্ম্মের উদ্দেশ্য হইতে পারে? আমি জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহার্থ স্নানপান আহার-ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে ঈশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে?

এ কথা বুঝিবার জন্য, আগে স্থির করিতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কি? মনুষ্যের আরাধনা করিতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তুতি করি। কিন্তু ঈশ্বরকে সেরূপ তোষামোদ-প্রিয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাঁহার স্তবস্তুতি করিলে যদি আমাদের নিজের সুখ কি চিত্তোন্নতি হয়, তবে এরূপ স্তবস্তুতি করার পক্ষে কোন আপত্তিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু তাই বলিয়া, ইহাকে প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ, যাহাকে সাধারণতঃ "যাগ যজ্ঞ" বলে, পুষ্প চন্দন নৈবেদ্য হোম বলি উৎসব এ সকলও ঈশ্বরারাধনা নহে।

ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন ঈশ্বরারাধনা বটে, কিন্তু তোষামোদে তাঁহার তুষ্টিসাধন হইতে পারে না। তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন, তাঁহার নিয়ম প্রতিপালনই তাঁহার তুষ্টি-সাধন—তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা। এই তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্যের সম্পাদন ও তাঁহার নিয়ম প্রতিপালন কাহাকে বলি? বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ এক কথায় এই প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর দিয়াছেন—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত
সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য ॥"

সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা; আমরা ক্রমশঃ ভূয়োভূয়ঃ দেখিব, গীতোক্ত ঈশ্বরারাধনাও তাই—সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বভূতে আত্মবৎ জ্ঞান, এবং সর্ব্বভূতের হিত-সাধন।

অতএব কর্ম্মযোগীর কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, সর্ব্বভূতের হিতসাধন।

যে কর্ম্মকর্ত্তা, সে নিজেও সর্ব্বভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত। জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন। এ সকল কথা আমি সবিস্তারে ধর্ম্মতত্ত্বে বুঝাইয়াছি, পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

এই নবম শ্লোকে বলা হইতেছে যে, "যজ্ঞ" (যে অর্থেই হউক) ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম বন্ধন মাত্র। "বন্ধন" কি, এইটা বুঝাইতে বাকি আছে। অন্যবিধ কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বা পাপজনক, এমন কথা বলা হইতেছে না—বলা হইতেছে, তাহা বন্ধনস্বরূপ। এই বন্ধন বুঝিতে জন্মান্তরবাদ স্মরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম করিলেই জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল—সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহা ভোগ করিবার জন্য, জীবকে জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হইবে। যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন জীবের মুক্তি নাই। মুক্তির প্রতিবন্ধক বলিয়াই কর্ম্ম বন্ধন মাত্র।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে,—যদি জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মই কি ধর্ম্মানুমোদিত? না নিষ্কাম কর্ম্মও যা, সকাম কর্ম্মও তা?

আমি ধর্ম্মতত্ত্বে এ কথার উত্তর দিয়াছি। নিষ্কাম কর্ম্ম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই। মনুষ্যত্ব ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্থায়ী সুখ নাই। অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম্ম বিশ্বজনীন।

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

পূর্ব্বকালে, প্রজাপতি প্রজাগণের সহিত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "ইহার দ্বারা তোমরা বর্দ্ধিত হইবে, ইহা তোমাদিগের অভীষ্টপ্রদ হইবে"। ১০।

এখানে 'যজ্ঞ' শব্দে আর 'ঈশ্বর' নহে বা ঈশ্বরারাধনা নহে। কেবল যজ্ঞই অর্থাৎ শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই যজ্ঞ; এবং পরবর্ত্তী ১২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ শ্লোকেতে যজ্ঞ শব্দে কেবল ঐ যজ্ঞই বুঝায়। এক শ্লোকে একার্থে একটি শব্দ কোন অর্থবিশেষে ব্যবহৃত করিয়া, তাহার পর ছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার করে না। এজন্য অনেক আধুনিক পণ্ডিত নবম শ্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন। কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্ স্বকৃত অনুবাদে যজ্ঞার্থে sacrifice লিখিয়াছেন। তাহার পর দশম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"Probably the sacrifices spoken of in that passage (নবম শ্লোকে) must be taken to be the same as those referred to in this passage." ডেবিস্ সাহেবও তৎপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাষ্য দেখিয়াও গ্রাহ্য করেন নাই, নোটে এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এদিকে কামধুকের স্থানে *Kamduk* লিখিয়া বসিয়াছেন! একবার নহে, বার বার !!!

এতক্ষণ ভগবান্ সকাম কর্ম্মের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা করিতেছিলেন। কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব যজ্ঞার্থে ঈশ্বর না বুঝিলে ইহাই বুঝিতে হয়, ভগবান্ সকাম কর্ম্ম করিতে উপদেশ দিতেছেন। তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদ তাঁহার কণ্ঠস্থ।

এক্ষণে এই শ্লোকটা সম্বন্ধে একটা কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে। বলা হইতেছে, প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এমন কেহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা জীব বা জিনিস; প্রজাপতি যখন মনুষ্যসৃষ্টি করিলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করিলেন। ইহার অর্থ এই যে, বেদে যজ্ঞবিধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিলেন, তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দু এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইবেন, কিন্তু আমার অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোক নহেন। আমার পাঠকেরা বলিবেন, প্রথমতঃ প্রজাসৃষ্টিই মানি না—মনুষ্য ত বানরের বিবর্ত্তন। তার পর, বেদ, নিত্য বা অপৌরুষেয় বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না। পরিশেষে, প্রজাপতি যে প্রজাসৃষ্টি করিয়া যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করিয়া শুনাইলেন, ইহাও মানি না।

মানিবার আবশ্যকতা নাই। আমিও মানি না। শ্রীকৃষ্ণও মানিতে বলিতেছেন না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে। এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্ত্তী কয়েকটি শ্লোকের প্রকৃত তাৎপর্য্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব।

পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন,

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

তোমরা যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধিত কর; দেবগণ তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করুন। পরস্পর এইরূপ সংবর্দ্ধিত করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিবে। ১১।

টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, "তোমরা হবির্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবর্দ্ধিত করিবে, দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অন্নোৎপত্তি করিয়া তোমাদিগকে সংবর্দ্ধিত করিবেন।" আমরা ত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের ঘি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাঁহাদের পুষ্টিসাধন হয়। বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞের দ্বারা সংবর্দ্ধিত দেবগণ, যে অভীষ্ট ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাঁহাদিগকে তদ্দত্ত (অন্ন) না দিয়া, যে খায়, সে চোর। ১২।

শ্রীধর স্বামী বলেন, (বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না) "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা," পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা না দিয়া যে খায়, সে চোর। পঞ্চযজ্ঞ যথা—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিভোজনম্॥

অর্থাৎ ব্রহ্মযজ্ঞ বা অধ্যাপন, পিতৃযজ্ঞ বা তর্পণ, দৈবযজ্ঞ বা হোম, ভূতযজ্ঞ বা বলি, এবং নরযজ্ঞ বা অতিথি-ভোজন। ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, শ্রীধর "পঞ্চযজ্ঞৈরদত্ত্বা" বলেন না, "পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা" বলেন।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

যে সজ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। যাহারা কেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাপিষ্ঠেরা পাপভোজন করে। ১৩।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ১৪॥

অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে; যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য জন্মে। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি। ১৪।

পর্জ্জন্য একটি বৈদিক দেবতা। তিনি বৃষ্টি করেন। এখানে পর্জ্জন্য অর্থে বৃষ্টি বুঝিলেই হইবে।

অন্ন হইতে জীবের উৎপত্তি। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয়, এবং বোধগম্য বটে। টীকাকারেরা বুঝাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোণিত হয়, তাহা হইতে জীব জন্মে। ইহাই যথেষ্ট।

তার পর, বৃষ্টি হইতে অন্ন। তাহাও স্বীকার করা যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না হইলে ফসল হয় না। কিন্তু যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি, এ কথাটা বৈজ্ঞানিক স্বীকার করিবেন না। টীকাকারেরা বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে। অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে। অধিকাংশ মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে। যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয়। সে যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এ স্থলে আলোচিত হইতেছে না। তবে কি ভগবদুক্তি অসত্য ও অবৈজ্ঞানিক? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি।

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্‌।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫ ॥

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত জানিও ; ব্রহ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্ভূত ; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। ১৫।

টীকাকারেরা বলেন, ব্রহ্ম শব্দে এখানে বেদ বুঝিবে। এবং অক্ষর পরমাত্মা। তবে কেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে ব্রহ্ম শব্দে পরব্রহ্ম বুঝেন। নহিলে অর্থ হয় না। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছেন। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং দ্বিতীয় চরণেও ব্রহ্ম শব্দে বেদ বুঝিয়াছেন, অতএব এই শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ করা যায়।

প্রথম, শ্রীধরাদির মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

দ্বিতীয়, শঙ্করাচার্য্যের মতে—

"কর্ম্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে ; অতএব বেদ সর্ব্বার্থ-প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন।"

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন ; স্থূল তাৎপর্য্যের বিঘ্ন কোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ ॥

এইরূপ প্রবর্ত্তিত চক্রের যে অনুবর্ত্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, সে অনর্থক জীবন ধারণ করে। ১৬।

(ইন্দ্রিয়সুখে যাহার আরাম, সেই ইন্দ্রিয়ারাম।)

ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন। কর্ম্ম করিলে এই জগচ্চক্রের অনুবর্ত্তন করা হইল। কেন না, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ্ঞ হইতে মেঘ হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অন্ন হইতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের একভাগ। এ ভাগ সত্য নহে ; কেন না, আমরা জানি, কর্ম্ম করিলেই যজ্ঞ * হয় না,

* যদি বল, শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মই কর্ম্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম নাই, তাহা হইলে "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" (৫ম শ্লোক), এবং "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" (৮ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যের অর্থ নাই।

যজ্ঞ করিলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শস্য হয় না (সকল মেঘে বৃষ্টি নাই এবং অতিবৃষ্টিও আছে) ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম্ম আছে, বিনা যজ্ঞেও মেঘ হয়, বিনা মেঘেও শস্য হয় (যথা রবিখন্দ), শস্য বিনাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, (উদাহরণ, সকল অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়া খায়) ইত্যাদি।

চক্রের দ্বিতীয় ভাগ এই যে, ব্রহ্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম্ম। ইহাও বিরোধের স্থল। ব্রহ্ম হইতে বেদ না বলিয়া, অনেকে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ব্রহ্মসম্ভূতও নহে, ঋষিপ্রণীত মাত্র, তাহার প্রমাণ বেদেই আছে। তার পর, বেদ হইতে কর্ম্ম, এ কথা কেবল শ্রৌত কর্ম্ম ভিন্ন আর কোন প্রকার কর্ম্ম সম্বন্ধে সত্য নহে। পাঠক দেখিবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ পর্য্যন্ত আমরা অনৈসর্গিক কথার ঘোরতর আবর্ত্তে পড়িয়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক, (unscientific) কথা। এখানে মহর্ষিতুল্য প্রাচীন ভাষ্যকারেরা কেহই সহায় নহেন; তাঁহারা বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভরিয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। আমরা ম্লেচ্ছের শিষ্য; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই। তবে ইহা আমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিব যে, গীতা, বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ নহে। বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বপ্রচার জন্য Huxley বা Tyndale ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশা করা যায় না।

তবে, পাঠক বলিতে পারেন যে, যাহা তুমি ভগবদুক্তি বলিতেছ, তাহা ভ্রমশূন্য ও অসত্যশূন্য হওয়াই উচিত। অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল। ঈশ্বরের অসত্য কথা কি প্রকারে সম্ভবে?

কিন্তু এই সাতটি শ্লোক যে ভগবদুক্তি, তাহা আমি বলিতে পারি না। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদুক্তি এমন কথা বিশ্বাস করা উচিত নহে। আমি বলিয়াছি যে, কৃষ্ণকথিত ধর্ম্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যিনি সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহার নিজের মতামত অবশ্য ছিল। তিনি যে নিজ-সঙ্কলিত গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চালান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় টীকাকারও সঙ্কলনকর্ত্তাসম্বন্ধে "প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ", ইহা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, "কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চব্যরচয়ৎ।" এখানে দেখিতে পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের সঙ্গে এই সাতটি শ্লোকের বিশেষ বিরোধ। এজন্য ইহা ভগবদুক্তি নহে—সঙ্কলনকর্ত্তার মত—ইহাই আমার বিশ্বাস।

তবে ইহাও আমার বক্তব্য যে, ইহা যদি প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ সকল কথা উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়া উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আমি 'কৃষ্ণচরিত্রে' দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পার্থিব কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করেন, ঐশী শক্তি দ্বারা নহে। মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ ভিন্ন, ঈশ্বরের মনুষ্যদেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না। কৃষ্ণ যদি মানবশরীরধারী ঈশ্বর হয়েন, তবে তাঁহার মানুষী শক্তি ভিন্ন ঐশী শক্তির দ্বারা কার্য্য করা অসম্ভব, কেন না, কোন মানুষেরই ঐশী শক্তি নাই—মানুষের আদর্শেও থাকিতে পারে না। কেবল মানুষী শক্তির ফল যে ধর্ম্মতত্ত্ব, তাহাতে তিন সহস্র বৎসর পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। ঈশ্বরের তাহা অভিপ্রেত নহে।

আর, এই বৈজ্ঞানিকতা সম্বন্ধে আর একটা কথা আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। এখনকার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞান যে অবস্থায় দাঁড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাখিলেন। বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগতি, তাহাতে তিন চারি হাজার বৎসর পরে বিজ্ঞানে যে কি না করিবে, তাহা বলা যায় না। তখন হয় ত মনুষ্য জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি করিবে, ইথরের তরঙ্গে চড়িয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল* বা রোহিণী নক্ষত্র† বেড়াইয়া আসিবে, হিমালয়ের উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গলাদি গ্রহ উপগ্রহবাসী কিম্ভূতকিমাকার জীবগণের সঙ্গে কথোপকথন বা যুদ্ধ করিবে, এ বেলা ও বেলা সূর্য্যলোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে। মনে কর, ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞতাপ্রযুক্ত এই ভাবী বিজ্ঞানের সঙ্গে সুসঙ্গতি রাখিয়া তদুপযোগী ভাষায় নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিলেন। করিলে, শুনিবে কে? বুঝিবে কে? অনুবর্ত্তী হইবে কে? কেহ না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত। তার পর, ক্রমশঃ মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে, সেই প্রাচীন কালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে। সেই জন্যই শঙ্করাদি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকৃত গীতাভাষ্য থাকিতেও, আমার ন্যায় মূর্খ অভিনব ভাষ্যরচনায় সাহসী।

এই সাতটি শ্লোক যে বৈজ্ঞানিক অসত্যে কলঙ্কিত, এই প্রথম আপত্তির আমি এই তিনটি উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক গীতোক্ত নিষ্কাম ধর্ম্মের বিরোধী। এ আপত্তি অতি যথার্থ। তবে এই কয়টি শ্লোক কেন

* Great Bears. † Plerades.

এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা নবম শ্লোকের টীকায় বলিয়াছি। মধুসূদন সরস্বতী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ হইতে পারে। পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মর্ম্মার্থ অতি বিষদরূপে বুঝিয়াছেন, অতএব তাঁহার কৃত গীতার্থ-সন্দীপনী নাম্নী টীকা হইতে ঐ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সহযজ্ঞ" অর্থাৎ কর্ম্মাধিকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কাম্যকর্ম্মেরই উদ্ঘোষণা হইল। কিন্তু "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" এই বচনে কাম্যকর্ম্মের নিষেধও করা হইয়াছে, এবং গীতাতেও কাম্যকর্ম্মের প্রসঙ্গ নাই, এজন্য ব্রহ্মার উক্তি এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে, এ আশঙ্কা বিদূরিত হইবে। "প্রজাগণ, তোমরা কামনা করিয়া ফলপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও" ব্রহ্মা এ কথা বলেন নাই। কর্ত্তব্যানুরোধে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই ব্রহ্মার উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কর্ম্মসাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন, "তোমরা নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিও। তাহারই অলৌকিক প্রভাবে, তোমরা যখন যাহা বাসনা করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে থাকিবে। লোকে আম্রেরই জন্য যেমন আম্রবৃক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়া ও মুকুলের সদ্গন্ধ তাহারা বিনা চেষ্টাতেই পাইয়া থাকে, সেইরূপ কর্ত্তব্যের অনুরোধেই কর্ম্ম সাধন করিবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল কামনা না করিলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলে ইচ্ছা না থাকিলেও কর্ম্মের স্বভাব-গুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের ন্যায়, এ উত্তরও সন্তোষজনক হইবে না। কিন্তু বিচারে বা প্রতিবাদে আমার কোন প্রয়োজন নাই। এই সাতটি শ্লোকের ভিতর একটি রহস্য আছে, তাহা দেখাইয়া দিয়া ক্ষান্ত হইব।

গীতাকার বলিতেছেন যে—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।*

এ কথা গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই। এইরূপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতায় আছে,

কর্ম্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোঽসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ।
সাধ্যানাঞ্চ গণং সূক্ষ্মং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতনম্॥

১-২২। ইত্যাদি।

---

* ইহার অনুবাদ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

"যজ্ঞের দ্বারা দেবগণ পরিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফলদান করেন, ইহা বৈদিক ধর্ম্মের স্থূলাংশ। ইহাই লৌকিক ধর্ম্ম।

এখন, পূর্ব্বপ্রচলিত প্রাচীন লৌকিক ধর্ম্মের প্রতি ধর্ম্মসংস্কারকের কিরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য? এমন লৌকিক ধর্ম্ম নাই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যিনি ধর্ম্মসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌকিক বিশ্বাসভুক্ত উপধর্ম্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন?

কেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ কর্ত্তব্য। মহম্মদ তাহাই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পরবর্ত্তী মহাপুরুষগণের তরবারির জোর তত বেশী না থাকিলে, তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। যীশুখ্রীষ্ট নিজে যীহুদা ধর্ম্মের উপরেই আপনার প্রচারিত ধর্ম্মতত্ত্ব সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তার পর খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম যে রোমক সাম্রাজ্য হইতে প্রাচীন উপধর্ম্মকে একেবারে দূরীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, রোমক সাম্রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল। যাহা জীবনশূন্য, তাহার মৃতদেহটা ফেলিয়া দেওয়া বড় কঠিন কাজ নহে। পক্ষান্তরে শাক্যসিংহের ধর্ম্ম, প্রাচীন ধর্ম্মের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই।

গীতাকারও বৈদিক ধর্ম্মের প্রতি খড়্গহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার কথিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ, কখনও লৌকিক ধর্ম্মের সমস্ত স্থান অধিকার করিতে পারিবে না। তবে লৌকিক ধর্ম্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সেই লৌকিক ধর্ম্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে। এজন্য তিনি সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যাঁহারা বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তাঁহাকে আমরা গণনা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সীমা এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ; নিষ্কাম কর্ম্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এই জন্য তিনি বৈদিক সকাম ধর্ম্মকে নিকৃষ্ট বলিয়াছেন। কিন্তু নিকৃষ্ট বলিয়া যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন কথা বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে এখানে গীতাকার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি।

যাহারা কর্ম্ম করে (সকলেই কর্ম্ম করে) তাহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইতেছে। প্রথম, যাহারা নিষ্কামকর্ম্মী, এবং যাহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে "আত্মরতি" বা "আত্মারাম" বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন ইন্দ্রিয়সুখের জন্য কর্ম্ম করে, ষোড়শ শ্লোকে তাহাদিগকে

"ইন্দ্রিয়ারাম" বলা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করে। দশম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে তাহাদেরই কথা বলা হইল। তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা করা যাইতে পারে যে, তাহারা "ইন্দ্রিয়ারাম" নহে—প্রচলিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া থাকে। যদিও তাহাদের ধর্ম্ম উপধর্ম্ম মাত্র, তথাপি তাহারা ঈশ্বরোপাসক ; কেন না, ঈশ্বর যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত। এই কথার তাৎপর্য্য আমরা পরে বুঝিব। দেখিব যে, কৃষ্ণ বলিতেছেন যে, আমি ভিন্ন দেবতা নাই। যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, তাহারা আমারই উপাসনা করে। সে উপাসনাকে তিনি অবৈধ উপাসনা বলিয়াছেন। কিন্তু তথাপি তাহাও তাঁহার উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বলিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কাহাদের মতটা উদার ? যাঁহারা বলেন যে, অবৈধ উপাসনা অনন্ত নরকের পথ, না যাঁহারা বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসনা মাত্র ঈশ্বরের গ্রাহ্য ? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। কাহাদের মত উদার ? যাঁহারা বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে; না যাঁহারা বলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানের মাপ করেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন ? কে নরকে যাইবে,—যে বলে যে নিরাকারের উপাসনা না করিলেই অনন্ত নরক, না যে যেমন বুঝে, তেমনই উপাসনা করে ?

গঙ্গা, বা Caspian Sea বা আমাদের লালদীঘি সবই জল। কিন্তু জল গঙ্গা নহে, Caspian Seaও নহে, বা লালদীঘি নহে। "জল মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়," বলিলে কখনও বুঝাইবে না যে, গঙ্গা মনুষ্যজীবনের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা Caspian Sea তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বা লালদীঘি তজ্জন্য প্রয়োজনীয়। অতএব বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষ্ণু, অতএব "যজ্ঞার্থে" বলিলে "বিষ্ণ্বর্থে" বুঝিতে হইবে, এ কথা খাটে না।

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচার্য্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না, এখন দেখা যাউক। আর কোন অভিপ্রায়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—তবে শতপথব্রাহ্মণ হইতে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাৎপর্য্য এই যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন। সেই দেবগণের মধ্যে বিষ্ণু এক জন। সেই যজ্ঞে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য যজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। অতএব এই বিষ্ণু ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র—

আদৌ আর পাঁচটা দেবতার সঙ্গে সমান। শঙ্করাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যা এই যে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ।" এখন যাহা বলিবেন যে, যদি "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, এমন কথা কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।

শঙ্করাচার্য্যের স্থায় পণ্ডিত দুই সহস্র বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাঁহার পাদুকা বহন করিবার যোগ্য। তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া আমাদের স্মরণ করিতে হইবে যে, গীতা যে আদ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপদ্ম-বিনির্গত, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতেন বা করিতে বাধ্য। কাজেই এখানে অপরের উক্তি কিছু আছে, বা যোড়াতাড়া আছে, এমন কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে, যদি যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থাৎ সকাম কর্ম্মের উৎসাহ দেওয়া হয়। তাহাতে অর্থবিরোধ উপস্থিত হয়। কেন না, এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সকাম কর্ম্ম অপ্রশংসিত ও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন। এই জন্য এখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর বলিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্ত্তী কয়টি শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে যজ্ঞার্থ কাম্যকর্ম্মই বুঝাইতে হইয়াছে। গীতায় এইরূপ কাম্যকর্ম্মের বিধি থাকার কারণ যোড়শ শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা প্রাপ্তির জন্য অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করিবে। ইহার জন্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি যুক্তি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে; কিন্তু অনাত্মজ্ঞের কর্ম্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই কথিত হইতেছে।

শ্রীধর স্বামী শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্ত্তী। তিনি নবম শ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্বরই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্যতঃ অকর্ম্ম (কর্ম্মশূন্যতা) হইতে কাম্যকর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পরবর্ত্তী শ্লোক কয়টি কথিত হইয়াছে।

সেই পরবর্ত্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিম্নে জানিতে পারিবেন। তাহার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যদি আমরা কেহ শঙ্করাচার্য্যকৃত নবম শ্লোকের যজ্ঞ শব্দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একটা সদর্থের সন্ধান করা আমাদের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ শব্দের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করিলে ক্ষতি কি? যজ্ ধাতু দেবপূজার্থে। অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসনা। যেখানে বহু দেবতার উপাসনা স্বীকৃত, সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ। কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ব্বদেবময়, যথা—

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥" ২৩ ॥

গীতা, ৯ অ।

সেখানে যজ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা। ভগবান্ তাহাই স্বয়ং বলিতেছেন—

"অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" ২৪ ॥

গীতা, ৯ অ।

যজ্ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধনার্থে পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপরিধৃত শ্লোকে তিনটি উদাহরণ আছে। আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে—

"ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

"যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ।"

গীতা, ২৫, ১০ অ।

অন্য গ্রন্থেও যজ্ঞ শব্দের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেক দেখা যায়। যথা, মহাভারতে—

"বাক্‌যজ্ঞেনার্চ্চিতো দেবঃ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন।"

শান্তিপর্ব্ব, ৪৭ অধ্যায়।

এখন এই নবম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বরারাধনা বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? তাহা করিলে, এই শ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয়।

কিন্তু যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিবার পক্ষে কিছু আপত্তি আছে। একটি আপত্তি এই :—এই শ্লোকের পরবর্ত্তী কয় শ্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে যজ্ঞ শব্দে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। "সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ" "যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ" "যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ" "যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ" "যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্" ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে বিষ্ণু বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম শ্লোকে যজ্ঞ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার করিয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ শ্লোকে ভিন্নার্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতাপ্রণেতা যে এরূপ করিবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। হয় গীতাকর্ত্তা রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় শঙ্করাদিকৃত যজ্ঞ শব্দের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ দুইয়ের একটাও স্বীকার করা যায় না। যদি তা না যায়, তবে স্বীকার

করিতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্য্যন্ত একার্থেই যজ্ঞ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একটা জোড়াতাড়া আছে।

প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম। কোথাও এমন প্রয়োগও নাই। 'হে যজ্ঞ!' বলিলে কেহই বুঝিবে না যে, 'হে বিষ্ণো!' বলিয়া ডাকিতেছি। "বিষ্ণুর দশ অবতার"এ কথার পরিবর্ত্তে কখনও বলা যায় না যে, "যজ্ঞের দশ অবতার"। "যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বনমালী" বলিলে, লোকে হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্রুতেঃ" যজ্ঞ বিষ্ণু, ইহা বেদে আছে।

শতপথব্রাহ্মণে* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহারা যজ্ঞকালে এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির দ্বারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে পারিবেন, তিনি আমাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন। বিষ্ণু তাহা প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথব্রাহ্মণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তদ্বিষ্ণুঃ প্রথমঃ প্রাপ। স দেবানাং শ্রেষ্ঠোঽভবৎ। তস্মাদাহুর্বিষ্ণুর্দেবানাং শ্রেষ্ঠ ইতি। স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সঃ। স যঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যঃ।"

অর্থ—ইহা বিষ্ণু প্রথমে পাইলেন। তিনি দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ হইলেন। তাই বলে, বিষ্ণু দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিষ্ণু, যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ, সেই আদিত্য।"

পুনশ্চ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "শিপিবিষ্ণায়" শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে।—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিঃ। যজ্ঞ এব পশুষু প্রতিতিষ্ঠতি।"† ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও লিখিয়াছেন, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ।"

অতএব শঙ্করাচার্য্যের কথা ঠিক—শ্রুতিতে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্তু কি অর্থে? একটা অর্থ এই হইতে পারে যে, বিষ্ণু যজ্ঞ, কেন না, সর্ব্বব্যাপী। ভট্ট ভাস্কর মিশ্রও তাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন, "বিষ্ণুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ সর্ব্বপ্রাণাত্মন্তর্যামিত্বেন প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ।"

এই গীতার ভিতর সন্ধান করিলেই পাওয়া যাইবে,—

---

* ১৪।১।১।

† ইহা আমি Muir সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সন্দেহের বিষয় আছে।

"অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥"

গীতা, ৯ অ, ১৬।

আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ঔষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হবন।

যদি তাই হয়, তবে বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে। বিষ্ণু সর্ব্বময়, এজন্য তিনি মন্ত্র, তিনি ঘৃত, তিনি অগ্নি; কিন্তু মন্ত্রও বিষ্ণু নহে, ঘৃতও বিষ্ণু নহে, অগ্নিও বিষ্ণু নহে। অতএব বিষ্ণু যজ্ঞ, কিন্তু যজ্ঞ বিষ্ণু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যা খাটে না।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

যে মনুষ্যের আত্মাতেই রতি, যিনি আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার কার্য্য নাই। ১৭।

দ্বিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ শ্লোক দেখ), দ্বিতীয় আত্মারাম। যে আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সেই আত্মারাম; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য। এই শ্লোকে তাহারই কথা হইতেছে।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেহই কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। কর্ম্ম ব্যতীত কাহারও জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, ব্যক্তি-বিশেষের কর্ম্ম নাই। অতএব কর্ম্ম বা কার্য্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে। বৈদিকাদি সকাম কর্ম্মই এখানে অভিপ্রেত। ভাবার্থ এই যে, যে আত্মতত্ত্বজ্ঞ, তাহার পক্ষে উপরিকথিত যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই।

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তাঁহার কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই; এবং কর্ম্ম অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই। সর্ব্বভূতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইঁহার প্রয়োজন নাই। ১৮।

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিবে। পুরুষ অসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে মুক্তিলাভ করে। ১৯।

'অসক্ত' অর্থে আসক্তিশূন্য অর্থাৎ ফলকামনাশূন্য। পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম শ্লোকের পর ১৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই 'তস্মাৎ' (অতএব) শব্দ অতিশয় সুসঙ্গত হয়। মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পর এই 'তস্মাৎ' শব্দ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম শ্লোকে বলা হইল যে, কর্ম্ম না করিলে, তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম শ্লোকে বলা হইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র। অতএব তুমি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর, অনাসক্ত হইয়া ঈশ্বরারাধনার্থ যে কর্ম্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্তিলাভ করে। ৮ম, তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ শ্লোক পড়িলে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্ত্তী নয়টি শ্লোক কিছু অসংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্ত্তী কয়টি শ্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও নহে। তাহা উপরে দেখাইয়াছি। অতএব এই নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা সাহস করিয়া বলিতে পারি না।

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

জনকাদি কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কর্ম্ম কর। ২০।

এই 'লোকসংগ্রহ' শব্দের অর্থে ভাষ্যকারেরা বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্ম্মে প্রবর্ত্তন। শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোককে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তন, অর্থাৎ আমি কর্ম্ম করিলে সকলে কর্ম্ম করিবে, না করিলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পতিত হইবে, এই লোকরক্ষণই লোকসংগ্রহ। শঙ্করও এইরূপ বুঝাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্তি নিবারণ লোকসংগ্রহ। পরশ্লোকে গীতাকার এই কথা পরিষ্কার করিতেছেন।

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

যে যে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ লোকে আচরণ করেন, ইতর লোকেও তাহাই করে। তাঁহারা যাহা প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচনা করেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। ২১।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞানীদিগের কর্ম্ম নাই। এক্ষণে কথিত হইতেছে যে, কর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহাদের কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কেন না, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে, সাধারণ লোক যাহারা আত্মজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম

হইতে বিরত হইবে। কর্ম্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। অতএব সকলেরই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা জ্ঞানমার্গাবলম্বী ছিলেন। জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কর্ম্ম নাই, ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষই কর্ম্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্ম্মা লোকের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এই অধঃপতন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবান্ উপরিলিখিত যে মহাবাক্যের দ্বারা কর্ম্মবাদ ও জ্ঞানবাদের সামঞ্জস্য বা একীকরণ করিলেন, ভারতবর্ষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখিলে, তদনুবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলে, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই তাঁহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, তাঁহারা কখনই আজিকার দিনের সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রস্ত হইতেন না—পরাধীন, পরমুখপ্রেক্ষী, পরজাতি-দত্তশিক্ষাবিপদ্‌গ্রস্ত হইতেন না।

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত করিয়াছেন, এমত নহে, মহাভারতে উদ্যোগপর্ব্বে সঞ্জয়যানপর্ব্বাধ্যায়েও তিনি ঐরূপ করিয়াছেন। তাহা গ্রন্থান্তরে উদ্ধৃত করিয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করত জীবন যাপন করিবে, এইরূপ শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট বিধি বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। কেহ কর্ম্মবশতঃ, কেহ বা কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু যেমন ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, তদ্রূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণগণের কদাচ মোক্ষলাভ হয় না। যে সমস্ত বিদ্যা দ্বারা কর্ম্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতী; যাহাতে কোনও কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিষ্ফল। অতএব যেমন পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির জলপান করিবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রূপ ইহকালে যে সকল কর্ম্মের ফল প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ম্মবশতই এইরূপ বিধি বিহিত হইয়াছে, সুতরাং কর্ম্মই সর্ব্বপ্রধান। যে ব্যক্তি কর্ম্ম অপেক্ষা অন্য কোনও বিষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া থাকে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।

"দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন। সমীরণ কর্ম্মবলে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন; দিবাকর কর্ম্মবলে আলস্যশূন্য হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ করিতেছেন; চন্দ্রমা কর্ম্মবলে নক্ষত্রমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া মাসার্দ্ধ উদিত হইতেছেন; হুতাশন কর্ম্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সংসাধন করিয়া নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম্মবলে নিতান্ত দুর্ভর

ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন; স্রোতস্বতী সকল কর্ম্মবলে প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে। অমিতবলশালী দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তিনি সেই কর্ম্মবলে দশ দিক্ ও নভোমণ্ডল হইতে বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমত্তচিত্তে ভোগাভিলাষ বিসর্জ্জন ও প্রিয় বস্তুসমুদয় পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম্ম প্রতিপালনপূর্ব্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন। ভগবান্ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সর, বিশ্বাবসু ও নক্ষত্রগণ কর্ম্মপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়াছেন; মহর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছেন।"

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, ইহা বলিয়া ভগবান্ কর্ম্মপরায়ণতার মাহাত্ম্য আরও পরিস্ফুট করিবার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :—

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥
যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

হে পার্থ! এই তিন লোকে আমার কিছুমাত্র কর্ত্তব্য নাই। অপ্রাপ্ত অথবা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই, তথাপি আমি কর্ম্ম করিয়া থাকি। ২২।

কর্ম্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম্ম না করি, তবে হে পার্থ! মনুষ্য সকলে সর্ব্বপ্রকারে আমারই পথের অনুবর্ত্তী হইবে। ২৩।

এখানে বক্তা স্বয়ং ভগবান্ জগদীশ্বর। ঈশ্বরের কোনও প্রয়োজন নাই, কোনও বিকার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাঁহার কোনও কর্ম্ম নাই। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং জগৎ চলিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগৎ চলিতেছে; তাহাতে তাঁহার হস্তক্ষেপণের কোনও প্রয়োজন নাই। এজন্য তাঁহার কর্ম্ম নাই। তবে তিনি যদি মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যশরীর ধারণ করেন, তাহা হইলে, তিনি মনুষ্যধর্ম্মী বলিয়া তাঁহার কর্ম্মও আছে। যদিও তিনি নিজের ঐশী শক্তির দ্বারা সকল প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুষ্যধর্ম্মিত্বহেতু কর্ম্মের দ্বারাই তাঁহাকে প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হয়। তিনি আদর্শ মনুষ্য, কাজে কাজেই তিনি আদর্শ কর্ম্মী। অতএব তিনি

কদাচ আলস্যপরবশ হইয়া কর্ম্ম না করিলে, লোকেও আদর্শ মনুষ্যের দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তনে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী হইবে। যে অলস ও কর্ম্মে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায়। তাই ভগবান্ পুনশ্চ বলিতেছেন,—

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোক সকল আমি উৎসন্ন দিব। সঙ্করের কর্ত্তা হইব এবং এই প্রজা সকলের মালিন্যহেতু হইব। ২৪।

ভাষ্যকারেরা এই সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিয়াছেন। হিন্দুরা জাতিগত বিশুদ্ধি-রক্ষার জন্য অতিশয় যত্নশীল; এজন্য বর্ণসঙ্কর একটা কদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়া প্রাচীন হিন্দুদিগের বিশ্বাস। মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজ্যনাশের কারণ, এবং এই গীতাতেই আছে—

"সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।"

কিন্তু আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে ঈশ্বরের আলস্যে বর্ণসঙ্করোৎপত্তির ভয়টাই এত প্রবল কেন? এমন ত কিছু বুঝিতে পারি না যে, ঈশ্বর বা শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়া ব্রাহ্মণীর নিকট, ক্ষত্রিয়কে ধরিয়া ক্ষত্রিয়ার নিকট, বৈশ্যকে ধরিয়া বৈশ্যার নিকট এবং শূদ্রকে ধরিয়া শূদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া বর্ণসাঙ্কর্য্য নিবারণ করেন। দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ব্বদেশব্যাপী রোগ, হত্যা, চৌর্য্য এবং দান, তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মের তিরোভাব ঈশ্বরের আলস্যে, এ সকলের কোনও শঙ্কার কথা না বলিয়া, বর্ণসাঙ্কর্য্যের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব সঙ্কর অর্থে বর্ণসঙ্কর বুঝিলে, এই শ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না।

কিন্তু সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা নাই। সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ। ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীকরণ ঘটিলে সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশৃঙ্খলা, ইংরেজিতে যাহাকে disorder বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য এই আমি বুঝি যে, তিনি কর্ম্মবিরত হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা ঘটিবে। আদর্শপুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলস্যপরবশ এবং কর্ম্মে অমনোযোগী হইলে, সামাজিক বিশৃঙ্খলতা যথার্থ ই সম্ভব।

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

হে ভারত! যেমন অবিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্তিবিশিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে, তেমনই লোকসংগ্রহচিকীর্ষু বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন। ২৫।

অবিদ্বানেরা ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে, বিদ্বানেরা লোকরক্ষার্থে অর্থাৎ ধর্ম্মার্থে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

বিদ্বানেরা কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। আপনারা অবহিত হইয়া ও সর্ব্ব কর্ম্ম করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ২৬।

যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা কর্ম্ম না করিলে অজ্ঞানেরা বিবেচনা করিতে পারে যে, আমাদিগেরও এই সকল কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে। অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টান্তদোষে অজ্ঞানদিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জন্মিতে পারে।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ক্রিয়মাণ। কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে বিমুগ্ধ, সে আপনাকে কর্ত্তা মনে করে। ২৭।

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

হে মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন, তাঁহারা বুঝেন যে, ইন্দ্রিয়সকলই বিষয়ে বর্ত্তমান; এ জন্য তাঁহারা কর্ম্মে আসক্ত হন না। ২৮।

যাঁহারা শরীর হইতে ভিন্ন আত্মা মানেন না, তাঁহারা উপরিব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের অর্থ বুঝিবেন না। ঐ দুই শ্লোক এবং তৎপূর্ব্বে বিদ্বান্ এবং অবিদ্বান্ জ্ঞানী অজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ যে ব্যবহৃত হইয়াছে, সে কেবল এই আত্মজ্ঞান লইয়া। যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, অর্থাৎ যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক্ অবিনাশী আত্মা আছেন, তাঁহাকেই বিদ্বান্ বা জ্ঞানী বলা হইতেছে। বলা হইতেছে যে, অবিদ্বান্ বা অজ্ঞানেরা কর্ম্মে আসক্ত বা ফলকামনাবিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্ জ্ঞানীরা কর্ম্মে অনাসক্ত বা ফলকামনাশূন্য। কিন্তু এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাকিলেই ফলকামনা পরিত্যাগ করে, এবং আত্মজ্ঞান

না থাকিলেই ফলকামনাবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে কেন, তাহাই এই দুই শ্লোকে বুঝান হইতেছে। ইন্দ্রিয়ের যাহা ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। কেন না, তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়। ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই কর্ম্ম। যাহার আত্মজ্ঞান নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে সংঘটন, তাহা আমা হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা। "আমিই কর্ম্মের কর্ত্তা" এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ম্ম করিয়াছি, এজন্য আমিই কর্ম্মের ফলভোগ করিব; তাই সে ফলকামনা করে। আর যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে, আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস আছে, ইন্দ্রিয় সকল আত্মার কোন অংশ নহে, ইহা যাঁহার বোধ আছে, তিনি জানেন যে, ইন্দ্রিয় বা প্রকৃতিই কর্ম্ম করিল। কেন না, তদ্দ্বারাই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সংঘটিত হইল। আত্মা কর্ম্ম করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার ফলভাগী নহেন। আত্মাই আমি; অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই বোধে, তাঁহারা ফলকামনা করেন না। অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞানী নিষ্কাম কর্ম্মের মূল। এবং এই তত্ত্বের দ্বারা জ্ঞানযোগের এবং কর্ম্মযোগের সমুচ্চয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্ম নিষ্কাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে ঘটে না। আমরা পরে দেখিব যে, কথিত হইতেছে কর্ম্ম হইতেই জ্ঞানে আরোহণ করিতে হয়। সে কথা বলিবার কারণ এইখানে নির্দ্দিষ্ট হইল।

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

যাহারা প্রকৃতির গুণে বিমূঢ়, তাহারা ইন্দ্রিয়ের কর্ম্মে অনুরাগযুক্ত হয়। সেই সকল মন্দবুদ্ধি অল্পজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানিগণ বিচালিত করিবেন না। ২৯।

অর্থাৎ তাহাদিগকে কর্ম্মফলকামনা পরিত্যাগ করিতে বলিলে, তাহা তাহারা পারিবে না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহারা সকাম কর্ম্ম পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। সকাম কর্ম্ম অভ্যস্ত না হইলে, নিষ্কাম কর্ম্ম সম্ভবে না; এই জন্য তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা বা বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে।

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অধ্যাত্ম-জ্ঞানের দ্বারা নিস্পৃহ মমতাশূন্য ও শোকশূন্য হইয়া যুদ্ধ কর। ৩০।

গোড়ার কথাটা এই হইয়াছিল যে, অর্জ্জুন আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তাদৃশ পাপকর্ম্মের দ্বারা রাজ্যলাভ করিতে অনিচ্ছুক; অতএব যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তদুত্তরে ভগবান্ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাঁহাকে উপদিষ্ট করিলেন। তার পর কর্ম্মের মাহাত্ম্য ও অবশ্য কর্ত্তব্যতা বুঝাইলেন। বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম্ম করিতেই হয়। অন্য কর্ম্ম না করিলেও, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিতে হয়। তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, সে মূর্খ ফলকামনা করিয়া কর্ম্ম করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম্ম করে; কিন্তু নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম করিতেই হইবে। যদি করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল; কেন না, নিষ্কাম কর্ম্মই পরম ধর্ম্ম। অতএব তুমি নিষ্কাম হইয়া, ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া, রাজ্যলাভ হইবে বা না হইবে, সে চিন্তা না করিয়া, কর্ম্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে যুদ্ধ কর।

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥

যে সকল মনুষ্য শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, তাহারা কর্ম্ম হইতে অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩১।

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

যাহারা অসূয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়, বিনষ্ট এবং বিবেকশূন্য বলিয়া জানিও। ৩২।

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানবান্ও, যাহা আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইরূপই চেষ্টা করে। জীবগণ প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রহে কোন ফল হয় না। ৩৩।

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ ॥

ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিঘ্নকারক। ৩৪।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মের নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। ৩৫।

তেত্রিশ, চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—এই তিন শ্লোকে যাহা কথিত হইল, তাহার মর্ম্মার্থ বুঝাইতেছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। জ্ঞানবান্‌ও আপন স্বভাবের অনুকূল যে কার্য্য তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রতিকূল কার্য্যে কাহাকে নিযুক্ত বা সুদক্ষ করা যায় না। কিন্তু লোকে যদি ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। স্বধর্ম্ম কি, তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম্মই যে স্বধর্ম্ম, এমন অর্থ করা যায় না। কেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সে সকল সমাজের প্রতি এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয়। কিন্তু ভগবদুক্ত ধর্ম্ম সার্ব্বজনীন, মনুষ্যমাত্রেরই রক্ষা ও পরিত্রাণের উপায়। অতএব স্বধর্ম্ম এইরূপই বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্ম্মকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রচলিত, এবং যে সমাজে সে ধর্ম্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধর্ম্মীরা পুরুষ-পরম্পরায় একজাতীয় কার্য্যকেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অন্য সমাজে, লোক আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। শক্তি ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বলিয়া স্বধর্ম্মই লোকের অনুকূল। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়াদির বশীভূত হইয়া ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকে পরধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এই অমঙ্গল পারলৌকিক অবস্থা সম্বন্ধেই বুঝেন। কিন্তু ইহলোকেও যে স্বধর্ম্মত্যাগ এবং পরধর্ম্ম অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা আমরা পুনঃপুনঃ দেখিতে পাই। যে সকল পুরুষ স্বধর্ম্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাণপণ যত্ন করেন, এবং তাহার সাধন জন্য মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করেন, তাঁহারাই ইহলোকে বীর বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন; এবং স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন। কিন্তু পরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ যাহা নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারিলেও, কেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, এমন দেখা যায়

না। অতএব পরধর্ম্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্ম্মের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল। বরং স্বধর্ম্মে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥ ৩৬॥

পরে অর্জ্জুন বলিতেছেন—

হে বার্ষ্ণেয়! পুরুষ কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হইয়া পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলের দ্বারা পাপে নিযুক্ত হয়?। ৩৬।

পূর্ব্বে কথা হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের রাগদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী। পুরুষের ইচ্ছা না থাকিলেও সে স্বধর্ম্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অর্জ্জুন এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে? কে এরূপ করায়?

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥ ৩৭॥

ইহা কাম। ইহা ক্রোধ। ইহা রজোগুণোৎপন্ন মহাশন এবং অত্যুগ্র। ইহলোকে ইহাকে শত্রু বিবেচনা করিবে। ৩৭।

আগে শব্দার্থ সকল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি; তাহা স্থানান্তরে কথিত হইবে। মহাশন অর্থে যে অধিক আহার করে। কাম দুষ্পূরণীয়, এজন্য মহাশন।

পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু একবচন ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই; দুইটি পৃথক্ রিপুর কথা হইতেছে না। ভাষ্যকারেরা বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে অর্থাৎ বাধা পাইলে, ক্রোধে পরিণত হয়; অতএব কাম ক্রোধ একই।

তবে কথাটা এই হইল যে, স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইহা সকলে পারে না। কেন না, স্বভাবই বলবান্; স্বভাবের বশীভূত বলিয়াই লোকে অনিচ্ছুক হইয়াই পরধর্ম্মাশ্রয় করে; পাপাচরণ করে। ইহার কারণ, কামের বলশালিতা। কাম অর্থে রিপুবিশেষ না বুঝিয়া, সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়মাত্রেরই বিষয়াকাঙ্ক্ষা বুঝিলে, এই সকল শ্লোকের প্রকৃত উদার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারা যাইবে।

ভগবদ্বাক্যের যাথার্থ্য এবং সার্ব্বজনীনতার প্রমাণস্বরূপ পরবর্ত্তী দেশী বিদেশী ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব।

প্রথম, রাজার স্বধর্ম্ম, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন। তিনি ধর্ম্মপ্রচারক বা ধর্ম্মনিয়ন্তা নহেন। এখানে Religion অর্থে ধর্ম্ম শব্দ ব্যবহার করিতেছি। কিন্তু মধ্যকালে ইউরোপে রাজগণ ধর্ম্মনিয়ন্তৃত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্যজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ St. Bartholomew, Sicilian Vespers এবং স্পেনের Inquisition এই তিনটা নামের উত্থাপনই যথেষ্ট। কথিত আছে, পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক Netherland দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল। আজকাল, ইংরেজরাজ্যে ভারতবর্ষে, রাজার এরূপ পরধর্ম্মাবলম্বন প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতবর্ষে কয়জন হিন্দু থাকিত ?

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গালা দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে। রাজার ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম ; বাণিজ্য বৈশ্যের ধর্ম্ম। রাজা এই সময়ে বৈশ্যধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন—East India Company বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার কার্পাসবস্ত্র, পট্টবস্ত্র, রেশম, পিত্তল, কাঁসা, সব ধ্বংসপুরে গেল ;—আভ্যন্তরিক বাণিজ্য কতক একবারে অন্তর্হিত হইল, কতক অন্যের হাতে গেল ; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্য-সমুদ্রে ডুবিল যে, আর উঠিল না। কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়িতে হইল। মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে না। সে বাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গটুকু আছে।

তৃতীয় উদাহরণ, আমেরিকার স্ত্রীজাতির আধুনিক স্বধর্ম্মত্যাগে ও পৌরুষ কর্ম্মে প্রবৃত্তি। ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রীজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গৃহে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং জাতীয় সুখ হানি। যে স্ত্রীলোক স্বগর্ভসম্ভূত শিশুকে স্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে স্মরণ করিয়া, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দুমহিলা অবশ্যই বলিবেন,

> স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।

> ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
> যথোল্বেণাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

যেমন ধূমে বহ্নি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আবৃত থাকে, তেমনই কামের দ্বারা (জ্ঞান) আবৃত থাকে। ৩৮।

"জ্ঞান" শব্দটি মূলে নাই,—তৎপরিবর্ত্তে "ইদম্" আছে। কিন্তু পরশ্লোকে "জ্ঞান" শব্দই আবৃতের বিশেষ্য ; এজন্য এ শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল।

৩৩শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্‌ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করে।

"সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞার্নবানপি"

জ্ঞানবান্ জ্ঞান থাকিতে কেন এরূপ করে ? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, জ্ঞান এই কামের দ্বারা আবৃত থাকে ; জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্ম্মণ্য হয়।

উপমা তিনটি অতি চমৎকার ; কিন্তু উপমার কৌশল বুঝাইবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক। "মল" শব্দে শঙ্করাচার্য্য "মল" অর্থাৎ মলাই বুঝিয়াছেন। কিন্তু শ্রীধর স্বামী বলেন, "মলেন" কিনা "আগন্তুকেন"। এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যে "মল" শব্দের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে।

উপমা তিনটির প্রতি দৃষ্টি করা যাউক। যাহা উপমিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই স্বাভাবিক। বহ্নির স্বাভাবিক আবরণ ধূম ; দর্পণ থাকিলেই ছায়া বা প্রতিবিম্ব থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু। তেমনই জ্ঞানের আবরণ কামও স্বাভাবিক। ইহা পূর্ব্বেই কথিত আছে। উপমেয় ও উপমিত উভয়ই প্রকাশাত্মক ; বহ্নি প্রকাশাত্মক, দর্পণ প্রকাশাত্মক, গর্ভ প্রকাশাত্মক ;—তেমনই জ্ঞানও প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবিশেষ। ফুৎকারাদির দ্বারা ধূমাবরণ, অপসারণের দ্বারা বিম্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উল্বণাবরণ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের প্রকাশ হয়, তেমনই ইন্দ্রিয়দমনের দ্বারা কামাবরণ বিনষ্ট হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। ইহা ৪১ শ্লোকে দেখিব।

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥

হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু, কামরূপে দুষ্পূর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া জ্ঞানকে আবৃত রাখে। ৩৯।

কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশত্রু। ভোগকালে সুখদায়ক, পরিণামে দুঃখদায়ক এবং ভোগকালেও যাহা নিষ্প্রয়োজনীয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দুঃখদায়ক, এই জন্য নিত্যশত্রু*। ইহা দুষ্পূর—কেন না, কিছুতেই ইহার পূরণ নাই ; এবং ইহা সন্তাপহেতু, এই জন্য অগ্নিতুল্য।

* ভাষ্যকারেরা এইরূপ বলেন।

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্রিয় সকল ও মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞানকে আবৃত রাখিয়া, এই সকলের দ্বারা, ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে। ৪০।

এই কাম কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। আত্মা হইতে পৃথক্। আত্মাকে আশ্রয় করিতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া রাখে।

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১ ॥

অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিয়া, জ্ঞানবিজ্ঞানবিনাশী পাপস্বরূপ কামকে বিনষ্ট (বা ত্যাগ) কর। ৪১।

যদি ইন্দ্রিয়গণই কামের অধিষ্ঠানভূমি, তবে আগে ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ত করিতে হইবে। তাহা হইলে কামকে বিনষ্ট করা হইবে।

জ্ঞান বা বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্মবিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয়, অথবা "জ্ঞান শাস্ত্রাচার্য্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নিদিধ্যাসজাত।" শঙ্করাচার্য্য বলেন, "জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আচার্য্যলব্ধ আত্মাদির অবরোধ। আর তাহার বিশেষ প্রকার অনুভবই বিজ্ঞান।" পাঠক এই ব্যাখ্যা অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পারিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে যথেষ্ট হইবে যে, কাম, সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান, ও আত্মার উন্নতির বিনাশক।

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত; ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ঠ; মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ; বুদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ। ৪২।

এইরূপ বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঝিয়া আপনাকে স্তম্ভিত করিয়া, হে মহাবাহো! তুমি কামরূপ দুরাসদ* শত্রুকে জয় কর। ৪৩।

পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন। ইহা অনুবাদে দুর্বোধ্য।

---

* দুরাসদ শব্দে দুর্ব্বিজ্ঞেয়, শ্রীধর স্বামী বুঝিয়াছেন।

বলা হইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। মন ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি। তবে ইন্দ্রিয়গণ কাহা হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাষ্যকারেরা বলেন, দেহাদি হইতে। তাহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্তু আধুনিক পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ইন্দ্রিয় কি দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র?

অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশাস্ত্রে কহে, চক্ষুঃশ্রবণাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, হস্তপদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং মন অন্তরিন্দ্রিয়। কিন্তু এ শ্লোকে মনকে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ বলা হইতেছে। সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ই এখানে অভিপ্রেত।

দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ হইল কিসে? ভাষ্যকারেরা বলেন, ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম ও প্রকাশক, দেহাদি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। কিন্তু এ কথা কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয় সম্বন্ধেই সত্য। আর জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে। তবে স্পষ্টতঃ ভাষ্যকারেরা দেহাদি শব্দের দ্বারা স্থূল পদার্থ বা স্থূলভূত অভিপ্রেত করিয়াছেন। স্থূল কথা এই যে, ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ।

বক্তার অভিপ্রায় কি, তাহা মূলে যে "আহুঃ" পদ আছে, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে। বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহা বলিতেছেন না, এইরূপ কথিত হইয়াছে বলিয়া বলিতেছেন। কে এরূপ বলিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। তাহা বুঝাইতেছি।

সাংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে। পর্য্যায়ক্রমে পঞ্চবিংশতি গণ এইরূপ।

১। প্রকৃতি।

২। মহৎ।

৩। অহঙ্কার।

৪ হইতে ১৯। পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়।

২০-২৪। পঞ্চ স্থূলভূত।

২৫। পুরুষ।

এই পর্য্যায়ের তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূলভূত। পুরুষ পরমাত্মা।

এই পর্য্যায়ানুসারে স্থূলভূত (ক্ষিত্যাদি, সুতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি) হইতে ন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্; কিন্তু সাংখ্যমতানুসারে মন ইন্দ্রিয় হইলে ন্যান্য ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, কেন না, অন্যগুলি বহিরিন্দ্রিয়; দ্বিতীয় গণ, অহঙ্কারকে জ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্যে বুদ্ধি বলিয়াছেন। অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু এমন বলিতে পারা যায় না, এই সাংখ্যদর্শন গীতাপ্রণয়নকালে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহা হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখ্য। গীতার প্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কথিত হইয়াছে,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥

আটটি মাত্র গণ কথিত হইল; পাঁচটি স্থূলভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার। শঙ্করাচার্য্য বলেন, পঞ্চভূতের গণনাতেই পঞ্চতন্মাত্র এবং ইন্দ্রিয় সকলের গণনা হইল বুঝিতে হইবে।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই আট প্রকার আমার প্রকৃতি। অতএব কপিল-সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের প্রভেদও অতি গুরুতর।

যাই হউক, শ্লোকোক্ত পারম্পর্য্য কতক বুঝা গেল। কিন্তু বুদ্ধির আর একটি অর্থ আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি বলা যায়।† এই অর্থে বুদ্ধি শব্দ যে গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোকের অবশিষ্টাংশ বুঝিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে। অন্য সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্মা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ।

---

* অপি চ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫।৬ শ্লোকে বলিতেছেন,

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬ ॥

ইহাতে কাপিল সাংখ্যের ২৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে। ইহা গণ বা পদার্থ বলিয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগৎকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্য নাই। অতএব কপিল সাংখ্য নহে। বরং কাপিল সাংখ্যের মূল এইখানে আছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে।

† বেদান্তসার—২৮।

এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব। এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে বুঝিয়া, আপনাকে নিশ্চল করিয়া কামকে পরাজিত করিতে হইবে। ইহার অপেক্ষা ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখনও কথিত হইয়াছে, এমন আমি জানি না।*

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

---

* সভ্যসমাজে মনুষ্যের একটি ইন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, "ইন্দ্রিয়দোষ" বলিলে সেই ইন্দ্রিয়ের দোষই বুঝায়। ইহার প্রাবল্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, অনেকে জিজ্ঞাসু হইয়াও লজ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বা তাঁহাকে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধারণ করিতে অক্ষম। অতএব ইন্দ্রিয়দমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(১) শারীরিক ব্যায়াম। ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত হয়। শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে ইন্দ্রিয়ের দূষণীয় বেগ জন্মিতে পারে না।

(২) আহারের নিয়ম। উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ করিবে। মদ্যাদি বিশেষ নিষেধ। মৎস্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মৎস্যের অনেক সদ্গুণ আছে; কিন্তু মৎস্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক। অতএব মৎস্য মাংসের অল্প ভোজনই ভাল। মৎস্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রহ্মচারীর পক্ষে হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মৎস্য হিন্দুমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৩) আলস্য পরিত্যাগ। আলস্য ইন্দ্রিয়দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। আলস্যে কুচিন্তার অবসর পাওয়া যায়,—অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে ইন্দ্রিয়সুখচিন্তাই বলবতী হয়। অন্য কর্ম্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি-চেষ্টাই প্রবল হয়। যাঁহার বিষয়কর্ম্ম আছে, তিনি বিষয়কর্ম্মে বিশেষ মনোনিবেশ করিবেন এবং অবসরকালেও বিষয়কর্ম্মের উন্নতিচেষ্টা করিবেন। তাহাতে দ্বিবিধ শুভফল ফলিবে;—ইন্দ্রিয়ও শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্ম্মেরও উন্নতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম্ম-চিন্তার দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয়ী হইয়া উঠে। সেটা মানসিক অবনতির কারণ হয়। অতএব যাঁহারা পারেন, তাঁহারা অবসরকালে সুসাহিত্য পাঠ বা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিবেন। যাঁহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী, তাঁহারা আপনার কার্য্য শেষ করিয়া পরের কার্য্য করিবেন। পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, বালকবালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার তত্ত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবাসিগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তত্ত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল অতিবাহিত করিতে পারেন। ইহাতে যাঁহাদের মন না যায়, তাঁহারা কোনও গুরুতর পরকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা স্কুল বা একটা ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে ব্রতী হইয়া অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

(৪) অতি প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ। যাহারা ইন্দ্রিয়পরবশ, অশ্লীলভাষী, অশ্লীল আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের দৃষ্টান্ত, প্ররোচনা, ও কথোপকথনে দেবর্ষিগণও কলুষিত হইতে পারেন। সভ্য সমাজে বাসের একটি প্রধান অমঙ্গল এই কুসংসর্গ।

(৫) সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়—কেবল ঈশ্বরচিন্তার নীচে—পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়। এ বিষয়ে অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই।

এই সকল কথা যদিও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক, তথাপি ইহা লোকের পক্ষে অশেষ মঙ্গলকর বলিয়া এ স্থানে লিখিত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—

এই অব্যয়যোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম। সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১।

এই যোগের ফল অব্যয়, এজন্য ইহাকে অব্যয় বলা হইয়াছে। ইক্ষ্বাকু মনুর পুত্র, এবং সূর্য্যবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ।

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২ ॥

এইরূপ পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজর্ষিগণ অবগত হইয়াছিলেন। হে পরন্তপ। এক্ষণে মহৎ কালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে। ২।

(টীকা অনাবশ্যক।)

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

তুমি আমার ভক্ত ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে বলিলাম। এ প্রসঙ্গ উত্তম। ৩।

(টীকা অনাবশ্যক।)

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্ব্বে ; আপনি যে ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, তাহা কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ?। ৪।

(টীকা অনাবশ্যক।)

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫ ॥

আমার বহু জন্ম অতীত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে। আমি সেগুলি সকলই অবগত আছি। হে পরন্তপ! তুমি জান না। ৫।

সহসা অবতারবাদের কথা উত্থাপিত হইল। কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝিবার জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অর্জ্জুন অবতারতত্ত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকটা কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে, ইহা সত্য বটে। কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র নামক মৎপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, মহাভারতের সকল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃষ্ণের অবতারত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ অবতারের কথা মাত্র নাই, এবং ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একত্র বিদ্যমান। তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাণগুলিতে আছে; কিন্তু পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে। ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি; আবার এ কথাও আছে যে, অবতার অসংখ্যেয়। শ্রীকৃষ্ণও এখানে আটটি কি দশটি কি বাইশটির কথা বলিতেছেন না। "বহু" অবতারের কথা বলিতেছেন। ভাগবতের "অসংখ্যেয়" এবং এই "বহু" শব্দ একার্থবাচক সন্দেহ নাই।

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

আমি অজ; আমি অব্যয়াত্মা; সর্ব্বভূতের ঈশ্বর; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি বশীকৃত করিয়া আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি। ৬।

অজ—জন্মরহিত।

অব্যয়াত্মা—যাঁহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর)।

ঈশ্বর—কর্ম্মপারতন্ত্র্য-রহিত (শ্রীধর)।

প্রকৃতি—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া, সর্ব্বজগৎ যাহার বশীভূত।

এতদ্ব্যতীত মূলে যে "অধিষ্ঠায়" শব্দ আছে, শঙ্করাচার্য্য তাহার অর্থ "বশীকৃত্য" লিখিয়াছেন, কিন্তু শ্রীধর স্বামী "স্বীকৃত্য" লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা অধিকতর সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা গিয়াছে।

স্থূল কথা এই যে, ভগবানের কথায় এই আপত্তি হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, তাঁহার জন্ম হইল কি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ;—যাঁহার জ্ঞান অক্ষয়, তাঁহার জন্ম হইবে কেন? জন্ম কর্ম্মাধীন,—যিনি ঈশ্বর, এজন্য কর্ম্মের অনধীন, তাঁহার জন্ম কেন?

উত্তরে ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাৎ সত্ত্বরজস্তম ইতি ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, সমস্ত জগৎ যাহার বশে আছে, যদ্দ্বারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বলিয়া জানিতে পারে না, সেই প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া আমি জন্মগ্রহণ করি। আপনার মায়ায়, কি না, সাধারণ লোক যেমন পরমার্থনিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে।

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল সত্ত্বমূর্ত্তির দ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অবতীর্ণ হই।

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার সাহায্যার্থ দুই একটি কথা বলা উচিত।

"মায়া" ঈশ্বরের একটি শক্তি। এই মায়া, হিন্দুদিগের ঈশ্বরতত্ত্বে, বিশেষতঃ উপনিষদে ও দর্শনশাস্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া কিরূপে পরিচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই গীতাতেই মায়া কিরূপ বুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতেছি। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ শ্লোকের টীকায় আমরা গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছিলাম,—

> ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
> অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥

ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার আমার ভিন্ন ভিন্ন অষ্ট প্রকার প্রকৃতি। ৪। ইহা বলিয়াই বলিতেছেন—

> অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
> জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

ইহা আমার অপরা বা নিকৃষ্টা প্রকৃতি ; আমার পরা বা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিও জান ইনি জীবভূতা, এবং ইনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ৫।

তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্বরূপা, এবং যাহা জগৎকে ধারণ করিয়া আছে, তাহা তাঁহার পরা প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শক্তিতে ভগবান্ জীবসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত করিয়া আপনার স্বত্বকে জীবরূপী করিতে পারেন।

ঈশ্বর শরীর ধারণপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিষ্প্রয়োজন ; কেন না, তিনি ইচ্ছাময় ও সর্ব্বশক্তিমান্,—পারেন না, এমন কথা বলিলে তাঁহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়া অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। তাহার বিচার আমি গ্রন্থান্তরে* যথাসাধ্য করিয়াছি—পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। আর শরীর ধারণপূর্ব্বক ঈশ্বর অবতীর্ণ হওয়ার কোন প্রয়োজন আছে কি না, ভগবান্ নিজেই পর-শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলিতেছেন।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

যে যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণতা এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে আপনাকে সৃজন করি। ৮।

সাধুগণের পরিত্রাণহেতু, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি†। ৯।

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥ ৯ ॥

হে অর্জ্জুন! আমার জন্ম কর্ম্ম দিব্য। ইহা যে তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে পুনর্জ্জন্ম প্রাপ্ত হয় না,—আমাকে প্রাপ্ত হয়। ৯।

দিব্য অর্থে "অপ্রাকৃত," "ঐশ্বর," বা "অলৌকিক"।

ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ক গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াছি যে, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের

---

* কৃষ্ণচরিত্র প্রথম খণ্ডে।

† এই সকলের কথাও আমি কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

মানবদেহ ধারণ। অন্য উদ্দেশ্য সম্ভবে না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ কর্ম্মী। অতএব কর্ম্মযোগীর পক্ষে আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্ম তত্ত্বতঃ বুঝা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত কর্ম্মযোগ, অন্ধকারে লোষ্ট্রক্ষেপ। যদি ইহা না স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মযোগ কথনকালে এই অবতারতত্ত্ব উত্থাপনের কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যিনি ভগবানের আদর্শকর্ম্মিত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে। যাহাকে দার্শনিকেরা জ্ঞানমার্গ কহেন, তাহার অর্থ এইরূপ প্রসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির পথ। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে, কিন্তু ব্রহ্ম কি? ব্রহ্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরিচ্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ। এই ব্রহ্মকে জানিলেই মুক্তিলাভ হয়। কিন্তু অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট যে ঈশ্বর, তাঁহাকে নিরাকার ইত্যাদি বলা যাইতে পারে না। তবে কি অবতীর্ণ এবং শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাঁহার উপাসনায় মুক্তির সম্ভাবনা নাই? এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে। অবতীর্ণ এবং শরীরী ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম্ম তত্ত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্তু তত্ত্বতঃ জানিতে হইবে। যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিলে সে লাভ নাই।

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

বীতরাগভয়ক্রোধ, মন্ময়, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পূত, অনেকে মদ্ভাবগত হইয়াছে। ১০।

প্রথমে কথার অর্থ। রাগ—অনুরাগ। মন্ময়—ব্রহ্মবিৎ, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল জ্ঞাননিষ্ঠ শ্রীধর বলেন, মৎপ্রসাদলব্ধ মদ্ভাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত।

ভাষ্যকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বলিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্ব্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ করিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্ত্তব্য যে, যাঁহারা আদর্শ কর্ম্মীর কর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্ত্তী পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্ম্মযোগের সঙ্গে এই সকল কথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

নিষ্কাম কর্ম্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাকিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাকিবে, এবং জ্ঞান ও তপের (Spiritual culture) দ্বারা চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে। ইহা না হইলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে না।

সকলেই নিষ্কামকর্ম্মী হইতে পারে না। যাহারা সকাম কর্ম্ম করে, তাহাদের কর্ম্মের কি কোনও ফল নাই? ঈশ্বর সকল কর্ম্মের ফলবিধাতা। ইহা পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥ ১১॥

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়। ১১।

অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক। অর্জ্জুন বলিতে পারেন, "প্রভো। আসল কথাটা কি, তা ত এখনও বুঝাও নাই। নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমাকে পাইব, আর সকাম কর্ম্মে কিছু পাইব না কি? সেগুলা কি পণ্ডশ্রম?" ভগবান্ এই সংশয়চ্ছেদ করিতেছেন। সকলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধীন হইয়া আমার উপাসনা করে না। যে যে-ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। যে কোনও কামনা করে না,—অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায়। কামনাভাবে তাহার কামনা পূর্ণ হয় না, কিন্তু সে আমায় পায়।

তার পর দ্বিতীয় চরণ। "মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়," এ কথার অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, "আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্ব্বপ্রকারে সেই পথে চলে।" এখানে সে অর্থ নহে—গীতাকারের "Idiom" ঠিক আমাদের "Idiom" সঙ্গে মিলিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, "উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য যে পথই অবলম্বন করুক না, আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে।" "মানুষ যে-দেবতারই পূজা করুক না কেন, সে আমারই পূজা করা হইবে; কেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই। আমিই সর্ব্বদেব—অন্য দেবের পূজার ফল আমিই কামনানুরূপ দিই। এমন কি, যদি মানুষ দেবোপাসনা না করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়াদির সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা। কেন না, জগতে আমি ছাড়া কিছু নাই—ইন্দ্রিয়াদিও আমি, আমিই

ইন্দ্রিয়াদি স্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই। ইহা নিকৃষ্ট ও দুঃখময় ফল বটে, কিন্তু যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান করি।"

পৃথিবীতে বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে। কেহ নিরাকারের, কেহ সাকারের উপাসনা করেন। কেহ একমাত্র জগদীশ্বরের, কেহ বহু দেবতার উপাসনা করেন; কোনও জাতি ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, কেহ সজীবের, কেহ নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করে। এই সকলই উপাসনা; কিন্তু ইহার মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষ আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সে উৎকর্ষাপকর্ষ কেবল উপাসকের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র। যে নিতান্ত অজ্ঞ, সে পথিপার্শ্বে পুষ্পচন্দনসিন্দূরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্পচন্দন সিন্দুর লেপিয়া যায়; যে কিঞ্চিৎ জানিয়াছে, সে না হয়, নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। কিন্তু ঈশ্বরের প্রকৃতির পরিমাণজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ। যে হিমালয় পর্ব্বতকে বল্মীক পরিমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র পরিমিত মনে করে, এ উভয়ে সমান অন্ধ। ব্রহ্মবাদীও ঈশ্বর স্বরূপ অবগত নহেন—শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে। তবে এক জনের উপাসনা ঈশ্বরের নিকট গ্রাহ্য, আর একজনের অগ্রাহ্য, ইহা কি প্রকারে বলা যাইবে? হয় কাহারও উপাসনা ঈশ্বরের গ্রাহ্য নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ্য। স্থূল কথা, উপাসনা আমাদিগের চিত্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাধন জন্য—ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যিনি তুষ্টি অতুষ্টির অতীত, উপাসনার দ্বারা আমরা তাঁহার তুষ্টিবিধান করিতে পারি না। তবে ইহা যদি সত্য হয় যে, তিনি বিচারক—কেন না, কর্ম্মের ফলবিধাতা—তবে যাহা তাঁহার বিশুদ্ধ স্বভাবের অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাঁহার গ্রাহ্য হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, কেবল লোকের কাছে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভের উপায়স্বরূপ, তাহা তাঁহার গ্রাহ্য নহে—কেন না, তিনি অন্তর্যামী। আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাঁহার কাছে গ্রাহ্য। যিনি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক, বা তপশ্চারী, তাঁহার উপাসনা যদি কেবল লোকের কাছে পসার করিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পরিমাণে ভগবানের গ্রাহ্য বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ শ্লোকের তাৎপর্য্য বুঝিলে, পৃথিবীতে আর ধর্ম্মগত পার্থক্য থাকে না;—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, জৈন, নিরাকারবাদী, সাকারবাদী, বহুদেবোপাসক, জড়োপাসক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের উপাসক—যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায়। এই

শ্লোকোক্ত ধর্ম্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম। একমাত্র সর্ব্বজনাবলম্বীয় ধর্ম্ম। ইহাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্মের তুল্য উদার ধর্ম্ম আর নাই—আর এই শ্লোকের তুল্য উদার মহাবাক্যও আর নাই।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

ইহলোকে যাহারা কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করে, তাহারা দেবগণের আরাধনা করে। এবং শীঘ্র মনুষ্যলোকেই তাহাদের কর্ম্মসিদ্ধি হয়। ১২।

অর্থাৎ সচরাচর মনুষ্য কর্ম্মফল কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে এবং ইহলোকেই সেই অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হয়।

সে ফল সামান্য। নিষ্কাম কর্ম্মের ফল অতি মহৎ। তবে মহৎ ফলের আশা না করিয়া, লোকে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্যের স্বভাব, যে যে-সুখ শীঘ্র পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে।

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি তাহার (সৃষ্টি)কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও বিকার-রহিত জানিও। ১৩।

হিন্দুশাস্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে, ব্রাহ্মণবর্ণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয় বাহু হইতে, বৈশ্য উরু হইতে, এবং শূদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্তু গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্ট হইয়াছে, এই কথা হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির সঙ্গে আপাততঃ সঙ্গত বোধ হয় না। নানা কারণে এ কথাটার বিস্তারিত বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ দেখা যায়, হিন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসূক্তে।

ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্তকে পুরুষসূক্ত কহে। উহার প্রথম ঋক্ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ" ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ আজিও বিষ্ণুপূজাকালে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ—যাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, বৈদিক কালে জাতিভেদ ছিল না,—তাঁহারা বলেন যে, এই সূক্ত আধুনিক। আমাদের সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিক সূক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। আমার বলিবার কথা, ঐ সূক্তে যাহা আছে, তাহাতে ঠিক এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে

ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে, ইত্যাদি। সেই ঋক্‌গুলি উদ্ধৃত করিতেছি—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্য কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত॥"

শূদ্রের সম্বন্ধে "অজায়ত" বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু (কৃত) হইলেন।* বৈশ্য সম্বন্ধেও বলা হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্য।

বেদের মধ্যে কেবল তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে (মধ্যতঃ) বৈশ্য, এবং চরণ হইতে শূদ্র সৃষ্টি করিলেন।

কিন্তু বেদের অন্যান্য ভাগে, চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি অন্য প্রকার কথিত হইয়াছে। শতপথ-ব্রাহ্মণে কথিত হইয়াছে, যথা—

"ভূরিতি বৈ প্রজাপতির্ব্রহ্ম অজনয়ত। ভুব ইতি ক্ষত্রং স্বরিতি বিশম্।" শূদ্রের কথা নাই।†

---

* ডাক্তার হোগ্‌, এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"Now, according to this passage, which is the most ancient and authoritative, we have on the origin of Brahmanism, and *caste in general*, the Brahmana has not come from the mouth of this primary being, the Purusha, but the mouth of the latter became the Brahmanical caste, that is to say, was transformed into it. The passage has no doubt an allegorical sense. (বেদের অনেক সূক্তে তাই) Mouth is the seat of speech. The allegory points out that the Bramans are teachers and instructors of mankind. The arms are the seat of strength. If the two arms of the Purusha are said to have been made a Kshattriya (warrior), that means, then, that the Kshattriyas have to carry arms to defend the empire. That the thighs of the Purusha were transformed into the Vaisya, that, as the lower parts of the body are the principal repository of food taken, the Vaisya caste is destined to provide food for the others." (এটুকু বড় কষ্ট কল্পনা,—উরুতে ডাল ভাত যায় না—কিন্তু এ সকল স্থানে উদর শব্দের প্রয়োগও হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায়। যথা—মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ৪৭ অধ্যায়ে—

"ব্রহ্ম বক্তৃং ভুজৌ ক্ষত্রং কৃৎস্নমূরূদরং বিশঃ" তার পর) "The creation of the Sudra from the feet of the Purusha indicates that he is destined to be a servant to the others, just as the foot supports the other parts of the body as a firm support." *Dr. Haug on the origin of Brahmanism*, p. 4.

Dr. Muirও বলেন, "It is indeed said that the Sudra sprang from Purusha's feet; but as regards the three superior castes and the members with which they are respectively connected, it is not quite clear which (*i. e.*) the castes or the members are to be taken as subjects, and which as the predicates, and consequently, whether we are to suppose verse 12. (উদ্ধৃত ঋক্) to declare that the three castes were the three members or conversely that the three members were, or became the three castes." *Sanskrit Texts*, Vol. II, p. 15, 2nd edition.

† ২।১।৪।১১ ইত্যাদি।

পুনশ্চ তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে—

"ঋগ্‌ভ্যো জাতং বৈশ্যং বর্ণমাহুঃ যজুর্ব্বেদং ক্ষত্রিয়স্যাহুর্যোনিম্। সামবেদো ব্রাহ্মণানাং প্রসূতিঃ।"* অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাহ্মণের, যজুর্ব্বেদ হইতে ক্ষত্রিয়ের এবং ঋগ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম। এখানেও শূদ্রের কথা নাই।

উদাহরণস্বরূপ এই মতগুলি উদ্ধৃত করা গেল। এমন আরও অনেক আছে। সকল উদ্ধৃত করিতে গেলে, পাঠকের বিরক্তিকর হইবে। স্থূল কথা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুর্ব্বর্ণ্য উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার মত আছে। শ্রীকৃষ্ণও যাহা বলিতেছেন, তাহাও সাধারণ মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে। তিনি বলেন না যে, আমি আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণবিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি। তিনি বলেন, গুণকর্ম্মের বিভাগানুসারে করিয়াছি। প্রথমে দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে।

সত্ত্বরজস্তম এই তিন গুণ। ভাষ্যকারেরা বলেন, সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম্ম শমদমাদি; সত্ত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদিগের কর্ম্ম শৌর্য্যযুদ্ধাদি; রজস্তমঃপ্রধান বৈশ্য, তাহাদিগের কর্ম্ম কৃষিবাণিজ্যাদি; তমঃপ্রধান শূদ্র, তাহাদিগের কর্ম্ম অন্য তিন বর্গের সেবা। এইরূপ গুণকর্ম্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাই ভগবদভিপ্রায়।

এক্ষণে, যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্ব্বেই সত্ত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা তমোগুণাধিক্য ইত্যাদি প্রকৃতি সৃষ্ট হয়?

যিনি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সত্ত্বপ্রধানাদি স্বভাব, তাঁহাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনুষ্যের বংশানুসারে নহে, গুণানুসারে তাহার ব্রাহ্মণত্বাদি। ব্রাহ্মণের পুত্র হইলেই তাহাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; সত্ত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শূদ্রের পুত্র হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাহ্মণের পুত্রের তমোগুণপ্রধান স্বভাব হইলে সে শূদ্র হইবে। ভগবদ্বাক্য হইতে ইহাই সহজ উপলব্ধি।

আমি যে একটা নূতন মত নিজে গড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে। প্রাচীন কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পূর্ব্বে, প্রাচীন ঋষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, যথা,—

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ॥

---

* ৩।১২।৯।২

পুনশ্চ—

> অগ্নিহোত্রব্রতপরান্ স্বাধ্যায়নিরতান্ শুচীন্।
> উপবাসরতান্ দাস্তাংস্তান্ দেবা ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥
> ন জাতিঃ পূজ্যতে রাজন্ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ।
> চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥
>
> গৌতমসংহিতা।

ক্ষমাবান্, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রাহ্মণ বলিতে হইবে, আর সকলে শূদ্র। যাহারা অগ্নিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দান্ত, দেবতারা তাঁহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। হে রাজন্! জাতি পূজ্য নহে, গুণই কল্যাণকারক। চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

পুনশ্চ, মহাভারতের বনপর্ব্বে মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে ঋষিবাক্য আছে, "পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শূদ্র সত্য, দম, ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি। কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়।" পুনশ্চ বনপর্ব্বে অজগরপর্ব্বাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজর্ষি নহুষ বলিতেছেন, "বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি সত্যাদি ব্রাহ্মণধর্ম্ম শূদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে।" তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে, অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয়, এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।"

কিন্তু হইতেছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্ম্মের কথা, কর্ম্মের ফলকামনার কথা,—চাতুর্ব্বর্ণ্যের কথা আসিল কেন? কথাটা বলা হইয়াছে যে, কেহ ইহকালে আশুলভ্য ফলের কামনায় দেবাদির যজনা করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া থাকে। লোকের মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখা যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ। এই প্রকৃতিভেদই চাতুর্ব্বর্ণ্য বা বর্ণভেদ। কিন্তু এই বর্ণভেদ কেন? ঈশ্বরেচ্ছা। ঈশ্বর ইহা করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্তু এরূপ কর্ম্ম করিয়াও তিনি অকর্ত্তা। কেন না, তিনি অব্যয়। তিনি যদি অব্যয়, তবে তিনি কর্ম্মফলের অধীন হইতে পারেন না—তাঁহার সুখ দুঃখ হ্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তিনি ফলের অধীন নহেন, তবে তাঁহার কৃত কর্ম্ম

নিষ্কাম। তিনি নিষ্কামকর্ম্মী। মনুষ্যও সেই জন্য নিষ্কাম না হইলে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে না। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন হওয়াই মুক্তি। কিন্তু শুদ্ধসত্ত্ব নিষ্কামস্বভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা লীন হইতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্মীই মুক্তির অধিকারী।

ঈশ্বর কর্ম্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিষ্যেরা মানিবেন না। তাঁহারা বলিবেন, ঈশ্বর কর্ম্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাঁহার সংস্থাপন নিয়মে (Law) নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম্ম। যাঁহারা বলিবেন, সেই সকল নিয়ম জড়ের গুণ, যদি তাঁহারা জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন, তবে তাঁহারা ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন। যাঁহারা তাহাও স্বীকার করেন না, তাঁহারা অনীশ্বরবাদী, তাঁহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্ম্মকারিত্ব সম্বন্ধে কোন বিচারই নাই।

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ ॥

কর্ম্ম সকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও কর্ম্মে ফলস্পৃহা নাই। এইরূপ আমায় যে জানে, সে কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ১৪।

ঈশ্বরের নিষ্কামকর্ম্মিত্ব না জানিলে, নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝা যায় না। তাহা জানিলে কর্ম্ম নিষ্কাম হইবে। তাহা হইলে সকাম কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। পূর্ব্ব-শ্লোকের যে টীকা দেওয়া গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট করা গিয়াছে।

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতমং কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালের মোক্ষাভিলাষিগণ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তুমি পূর্ব্ব-গামীদিগের পূর্ব্বকাল-কৃত কর্ম্ম সকল কর। ১৫।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে যাঁহারা মোক্ষকাম, তাঁহারা আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া—কর্ম্মের ফলভাগী নহি, ইহা জানিয়া কর্ম্ম করিতেন। তুমিও সেইরূপ কর্ম্ম কর।

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬ ॥

কর্ম্ম কি, অকর্ম্ম কি, পণ্ডিতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব কর্ম্ম কি, তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে। ১৬।

অকর্ম্ম অর্থে এখানে মন্দকর্ম্ম নহে—অকর্ম্ম অর্থে কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥ ১৭ ॥

কর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে হইবে। কর্ম্মের গতি দুর্জ্জেয়। ১৭।

কর্ম্ম—অর্থে বিহিত কর্ম্ম, যাহা যথার্থ কর্ম্ম।

বিকর্ম্ম—অবিহিত কর্ম্ম।

অকর্ম্ম—কর্ম্মত্যাগ, কর্ম্মশূন্যতা।

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ১৮ ॥

যে কর্ম্মেতেও কর্ম্মশূন্যতা দেখে, এবং অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখে, সেই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান। সেই যোগযুক্ত, এবং সেই সর্ব্বকর্ম্মকারী। ১৮।

ভগবদারাধনা কর্ম্ম; কিন্তু তাহাতে কর্ম্মের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য তাহাকে কর্ম্মস্বরূপ বিবেচনা করিবে না। আর যে কর্ম্ম বিহিত, তাহা না করিলে তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগিত্ব মুক্তির রোধক; এজন্য না করাকেই, অর্থাৎ অকর্ম্মকেই কর্ম্ম বিবেচনা করিবে। শ্রীধরের টীকার মর্ম্মার্থ এই। ইহাতে এ শ্লোক হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগবদারাধনাই কর্ত্তব্য। অন্যান্য অনুষ্ঠান মুক্তির বিঘ্ন।

শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ বুঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্থূল কথা এই—আত্মা ক্রিয়ানির্লিপ্ত; কর্ম্ম ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে; কিন্তু ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কর্ম্মারোপ হইয়া থাকে। যিনি ইহা জানেন, তিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন। আর ইন্দ্রিয়াদি বিহিতানুষ্ঠানে বিরত হইলেও সেই অকর্ম্মকেও তিনি ইন্দ্রিয়াদির কর্ম্ম দেখেন।

কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে, পরবর্ত্তী শ্লোকের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোজা অর্থ পাওয়া যায়। কামসংকল্প-বিবর্জ্জিত, ফলকামনাশূন্য যে কর্ম্ম, সে অকর্ম্ম—কর্ম্মশূন্যতা। আর যিনি অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে বিরত, তাঁহার ক[র্ত্ত]ব্য-বিরতির ফলভাগিত্ব আছেই আছে—অতএব এখানে কর্ম্মশূন্যতাও কর্ম্ম। কেন না, ফলোৎপত্তির কারণ। যিনি ইহা বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী।

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার সকল চেষ্টা কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত, এবং যাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন। ১৯।

"কামসঙ্কল্প" এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ৎ পরিমাণে নির্ভর করে। শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ এই;—"কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ," "কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্বর্জিতাঃ"। শ্রীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, "কাম্যতে ইতি কামঃ। ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জিতাঃ।" মধুসূদন সরস্বতী বলেন, কামঃ ফলতৃষ্ণা। সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জিতাঃ। এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধুসূদন সরস্বতীকৃত সঙ্কল্প শব্দের অর্থ আভিধানিক নহে, কিন্তু এখানে খুব সঙ্গত। শঙ্করাচার্য্যকৃত, কাম এবং তাহার কারণ সঙ্কল্প উভয়-বিবর্জিত হইলে কর্ম্মে প্রবৃত্তির অভাব জন্মিবে। যে কর্ম্ম করিবার অভিলাষ রাখে, এবং ফল কামনা করে না, সে কর্ম্ম করিবে কেন? এজন্য শঙ্কারাচার্য্য নিজেই বলিয়াছেন, "মুধৈব চেষ্টামাত্রম্ অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন জীবনযাত্রার্থং।" অর্থাৎ ঈদৃশ ব্যক্তির সমারম্ভ সকল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রবৃত্তিমার্গে, কেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃত্তিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ব্বাহার্থ। পাঠকদিগের নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, তাহা হইলেও কাম ও সঙ্কল্পবর্জিত হইল না।

মধুসূদন সরস্বতীও "লোকশিক্ষার্থং" ও "জীবনযাত্রার্থং" কথা দুইটা রাখিয়াছেন, কিন্তু "কামসঙ্কল্পবর্জিত" পদের তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিতে পারেন। ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাই বিহিত, এবং তাহাই কর্ম্মশূন্যতা।

সচরাচর লোকে ফলকামনাতেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়—এবং আমি এই কর্ম্ম করিতেছি, বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। ভগবদভিপ্রায় এই যে, দুইয়ের অভাবই কর্ম্মের লক্ষণ, কর্ম্মে তদুভয়ের অভাবই কর্ম্মশূন্যতা।

এইরূপ বুঝিলেই কি আপত্তির মীমাংসা হইল? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই লোকে সচরাচর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু ফলকামনা ব্যতীত যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, এমন নহে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে নিষ্কাম শব্দের অর্থ নাই—এমন বস্তুর অস্তিত্ব নাই। যদি তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও কোন মানে নাই। কথাটা পূর্ব্বে বুঝান হয় নাই। এখন বুঝান যাউক।

কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয়। যে সে কর্ম্মের ফলকামনা করে না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেয়। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা কামনা করে

না—মরিতে পারিলেই তাহার সব যন্ত্রণা ফুরায়। কিন্তু আত্মজীবন রক্ষা তাহার অনুষ্ঠেয়। যে শূলরোগী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই। শত্রুর জীবনরক্ষা সচরাচর কেহ কামনা করে না, কিন্তু শত্রু মজ্জনোন্মুখ, বা অন্য প্রকারে মৃত্যুকবলগ্রস্তপ্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। শত্রুকে উদ্ধার কালে মনে হইতে পারে, "আমার চেষ্টা নিষ্ফল হইলেই ভাল।" এখানে ফল কামনা নাই, কিন্তু কর্ম্ম আছে।

তবে ইহাও বলা কর্ত্তব্য যে, নিষ্কাম কর্ম্মে, ফলসিদ্ধির চেষ্টা নাই, এমন কথা বলাও যায় না, এবং গীতার সে অভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ্য, সে মুক্তি কামনা করে এবং মুক্তি প্রাপ্তির উপযোগী চেষ্টা করে। কাম শব্দ গীতায়, বা অন্যত্র এমন অর্থে ব্যবহার হয় না, যে তাহারও ফলসিদ্ধির চেষ্টা বুঝায় না। মনে কর, স্বদেশের বা স্বজাতির হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম। যে স্বদেশহিতের চেষ্টা করে, সে যে স্বদেশের হিতকামনা করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন কখনই হইতে পারে না। অতএব কাম শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝা কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি অপবর্গ—পুরুষার্থ। পুরুষার্থে, ইহা ভিন্ন আর কোন প্রয়োজন নাই। যাহা, ধর্ম্ম, অর্থ, অর্থাৎ ঐহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, এই তিনের অতিরিক্ত তাহাই কাম। এই জন্য কাম্য কর্ম্মের দ্বারা, স্বর্গাদি লাভ সাধনকে কাম শব্দে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্ম্মজনিত যে সুখভোগ, সে আপনার সুখ। অতএব কামের উদ্দিষ্ট যে সুখ—তাহা নিজের সুখ—পরের মঙ্গল নহে। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য পরহিতাদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কর্ম্মের উদ্দেশ্য নিজ হিত, তাহা নিষ্কাম নহে।

কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ করিয়া বুঝান আছে।

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয় মন, এবং হৃদয়, স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ, আমার বিবেচনায়, তাহাই কাম। তাহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।

অতএব কাম অর্থে আত্মসুখ।

এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে কর। যদি স্বদেশহিতৈষী কেবলমাত্র স্বদেশের হিতকামনা করিয়া কর্ম্ম করেন, তবে তাঁহারই কর্ম্ম নিষ্কাম। আর যদি আপনার যশ, মান সম্ভ্রম, উন্নতি প্রভৃতির বাসনায় স্বদেশের ইষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে তিনি সকামকর্ম্মা।

শুদ্ধিপত্র

পৃ.	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৬	২৯	Euphorbas	Euphorbos
	৩০	Hermotunos	Hermotimos
	৩২	soul entered the body of a cock. Mikyllos asks the cock to tell him of the siege	soul passed into the body of a cock. Mikyllos asks this cock to tell him
	৩৩	of Troy—were things there really as Homer has said?	about Troy—were things there really as Homer said?
	৩৪	have known, O Mikyllos when ···Bactria."	have known, O Mikyllos? When···Baktria!"
৫৯	৮	(৬, ৭)*	(৬, ১০)*
৭০	৭	(আনন্দগিরি)	(শ্রীধর স্বামী)
৭৪	৩	শঙ্কর এই কয় শ্লোককে	অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই কয় শ্লোককে
৭৮	১৫	ভাক্তর দ্বারা	ভক্তির দ্বারা
৮৭	১৯	তুলিতে	তুলিত
১০১	২১	শাস্কর	শাঙ্কর
১১৩	১৫	অনুষ্ঠানেই	অননুষ্ঠানেই
১১৫	২৬	ব্রব্যাজনাদিক	ব্রব্যার্জনাদিক
১৩৫	১২	আত্মতত্ত্বজ্ঞানী	আত্মতত্ত্বজ্ঞানই
	১৪	নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম	নিষ্কাম কর্ম্মও